ভাবমুখে

কার্তিক ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ ● ত্রিত্রিংশৎ বর্ষ ● শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ের
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

= লিমিটেড =

রেজিস্টার্ড অফিস—১৬৫ শরৎ বোস রোড
ক লি কা তা-২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
ক লি কা তা — ১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • কটক • ধানবাদ • পাটনা • শিলিগুড়ি • গৌহাটী

●

ORPHAN'S TEA
For
Health & Economy
[illegible]
[illegible]
Phone : 55-3304

যুগে যুগে যার আসা
স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত মূল্য—সাত টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D. RATAN & Co.
Photographers
PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST, CAL-6
PHONE : 54 - 5711

★

ডি. রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন: ৩৪-৫৭১১
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

কার্তিক
সপ্তম সংখ্যা

মাতৃ বাণী

ত্রিত্রিংশৎ বর্ষ
তেরশ' ত্রিরাশি

গান		শ্রীশ্রীঠাকুর
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য		শ্রীঅর্চনাপুরী
মিলিবে মিলিবে আমি নারীর দর্পণ		শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক
গুরু ভগবান		শ্রীআশা পুরী
শ্রবণ-মঙ্গলম্		সাধনা পুরী
শ্রীশ্রীগোপীনী সুন্দরজীর মহিমা কীর্তন		স্বামী লক্ষ্মোমর দাস
মনের মাঝে	২৩৮	শ্রীশরণা পুরী
জলে বড়ে	২৩৮	শ্রীরবি গঙ্গোপাধ্যায়
অলৌকিক রহস্যপূজা—শ্রীশ্রীমা সারদার		
দিব্যাধারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শীপূজা		শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ বাগচী
অভেদানন্দ		স্বামী অরুণানন্দ
বীরভূমের পুত্র কীর্তি		স্বামী নীলানন্দ
শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের চিঠি		
জয়প্রকাশ নারায়ণ স্মরণে		
To Sri Joyprakash Narayan	২৪৩	শ্রীদিলীপ কুমার রায়
শ্রীসত্যানন্দ ভাগবত	২৪৪	শ্রীগুরু
দুঃখের সম্রাট	২৪৫	সুধেন্দু মল্লিক

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অভিনব ও অসামান্য নব সংযোজন

সাহিত্যের সীমানা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

কবি ও কাব্য, সাহিত্যে ইতরতা—চরিত্রের, বিষয়ের, আদর্শের, ভাষার ইতরতা ও ইতরতার ভবিষ্যৎ, শ্রীঅরবিন্দের কাব্য ও কাব্যবিচার, অচিন্ত্যকুমারের কাব্যে ঈশ্বরানুভূতি, সাধক কবি সত্যানন্দের কবি প্রতিভা, গ্রামের কবি কুমুদরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতি ও কাব্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সংকলন।

মূল্য : ১৫·০০ টাকা

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
১৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

১। তোমার চরণতরী		
২। বর্ষা বিশাল		
৩। তরুণী আজকে যার দায়ী লাগতো (?)		
৪। আশ্রম সংবাদ		
৫। বন্ধুধর্মের সারতত্ত্ব		৬: শ্রীদুর্গাদাস বসু সরস্বতী বিদ্যাবারিধি
৬। মাতৃকৃপায় মুক্তিতীর্থ অমরনাথ		শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত
৭। শোকবার্ত্তা		
৮। পুস্তক সমালোচনা		
৯। সুধিমঃ শোকাঞ্জলি		
১০। রাতের বন্ধু		
World Psychology		
"Sweet Calm Shefali"		
Constant Expermentation —A Suicidal Policy In Education	61	*Principle* K. C. Karmakar
Veda-chhanda (Part III)—Sree Thakur	63	*Translate by* Sri S. N. Sanyal

RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

25, HARACHANDRA MULLICK STREET.
CALCUTTA-700005.

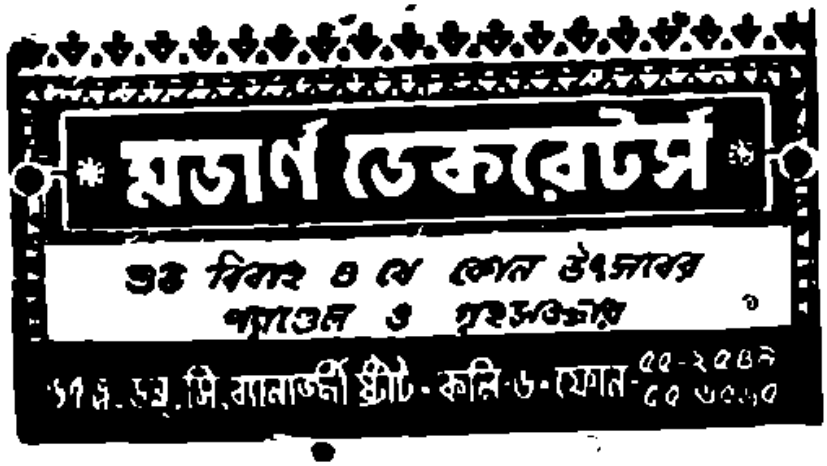

* আশ্রম পর্ব্ব পত্রী : কার্ত্তিক, ১৩৮৬

১৪শে নভেম্বর	৩রা অগ্রহায়ণ,	সোমবার	—অমাবস্যার হোম।
১৮শে "	১০ই "	সোমবার	—দুবরাজপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদা কাত্যায়নী দেবীর প্রতিষ্ঠা বিহিত পূজা আরম্ভ।
২৭শে	১১ই	মঙ্গলবার	—শ্রীশ্রীকাত্যায়নী দেবীর অষ্টমী বিহিত পূজা।
২৮শে	১২ই	বুধবার	" নবমী " "
২৯শে	১৩ই	বৃহস্পতিবার	—শ্রীশ্রীকাত্যায়নী দেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপন ও বিসর্জন।
৩০শে	১৪ই	শুক্রবার	—একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৩রা ডিসেম্বর	১৭ই	সোমবার	—পূর্ণিমার হোম।
১০ই "	২৪শে		—সিউড়ী আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৭তম জন্মমহোৎসব।
১৪ই		শনিবার	—একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।

* বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

GRAM DISWASHING

Office 24-1236
Works 55-1738

PELICAN ENGINEERS

FABRICATORS OF STAINLESS STEEL CHEMICAL PLANTS,
PHARMACEUTICAL & FRUIT PRESERVATION EQUIPMENTS.

4, Hartford Lane, Calcutta-700016.

Works 161, UPPER CHITPUR ROAD,
CALCUTTA-700005

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী গ্রন্থ

ক রু ণা ব তা র

শ্রীশরণাপুরী মূল্য : ১১·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৬

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র মিলবস্ত্র, সর্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইলি ও ওয়াশ্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলিকাতা ৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA, CALCUTTA-700056.

Phone : 58-1575

ফোন : ৩৩-৭৯৫৬

এন্, কে, স্পোর্টস্

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

★

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তরণা

শ্যামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নারিকেলডাঙ্গা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-১

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

৯১ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

॥ স্বত্বাধিকারী ॥

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of

ALLOY STEEL CASTINGS

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

ALSO

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS

OF

ALL SPECIAL GRADES & SIZES

★

QUALITY GUARANTEED

Works

K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah, (*West Bengal*)
Telephone : 69-2890

Head Office

N. G. Chakrabarti & Co.
3D, Nandy Street,
Calcutta-700029
Phone 42-5197

ভাবমুখে

ত্রিত্রিংশৎ বর্ষ	তেরশ' তিরাশি	কার্ত্তিক	সপ্তম সংখ্যা

গান

শ্রীশ্রীঠাকুর

অনেক দেরী হয়েছে মা হয়ে গেছে অনেক বেলা
পথ চলিতে পথের ধূলায় ধূলা খেলাও হল মেলা।
ভুলের বাথা জ'মল যত ভুলতে গিয়ে পথের ক্ষত
রাঙা হয়ে ওঠে কত মুখের কথায় হয় কি বলা।
সকল কথা ছেলে ভোলে টেনে যখন নেয় মা কোলে।
মায়ের দোলে আঁখির পাতা জড়িয়ে আসে মা-মা বোলে
অশরণের শরণ ব'লে তাইতো আমি এলেম চ'লে
চোখের জলে বুকের তলে এবার জুড়াবো মা সকল জ্বালা॥

— —

শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য

শ্রীঅর্কদাপুরী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

দিনে দিনে দিন যায় চলে যায় মাস
পূর্ণ হয়ে আসে যড়ঋতুর বিলাস।
সহসা ধরিল ঘুন জ্ঞান পুষ্ট দেহে
বাংলার আর্দ্রবাতাবরণের স্নেহে
ধরিল কোমল বর্ম পশ্চিমী শরীর
তোতাপুরী রোগাক্রান্ত তবু ধীর স্থির।
সেই জীর্ণ চর্মাসনে বসি দিবারাত
চলিছে আত্মার সনে দেহের সংঘাত
নিত্য চলে বিচারের তীক্ষ্ণ শেল হানি
ফিরাইয়া আনা মনে দেহ হতে টানি।
চকিতে ভাঙন ভুলি হেসে ওঠে মায়া
অনিকেত সন্ন্যাসীর চক্ষে ক্লান্ত ছায়া।
শেষ পথক্রান্তি বুঝি উত্তরিতে হায়
কে যেন ডাকিছে পিছে অশান্ত সন্ধ্যায়
"ফিরেই কি যাব চলে" ? ভাবে তোতাপুরী
চকিতে হাসিয়া ওঠে যেন তীক্ষ্ণছুরি
পরম প্রদীপ্ত জ্ঞান। করে শতখান
বিগলিত কুষ্ঠ ঘটির অস্পষ্ট অজ্ঞান।
কোথা যাবি ? স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোকে
মরিবে না কেহ নিত্য রোগ শোকে !
হবেনা বিনাশ কভু এই বিনাশীর ?
অজড় অব্যয় হবে আত্মা সমধির ?
মায়া যদি এই জীর্ণ ভগ্ন দেহ লাগি
কোথা যাবি দেবোপম শিষ্যে পরিত্যাগি ?
স্বগত উক্তির মত আপনার কানে
কহে তোতা বারবার, মন হয় ম্যানে।
ভোঁতে না সন্ন্যাসী হয়ে মায়ারে একান্তে
যার বিশ্ব বিমোহিনী অলোক মায়াতে
সুপ্রথিত তার মন ! যাসে নারায়ণ
সব মন দর্পহারী অতনু মোহন।

• • •

তিমিরের বক্ষ লয়া তমস্বিনী নিশা
নিদ্রাময়। অন্তহীন আঁধার বিদিশা।
শিশিরের অশ্রু ফেলি উষাদীপ হাতে
অন্বেষিকা তারাবধূ তন্দ্রাহারা রাতে
খুঁজিছে রোহিনী নামে ছায়া পথে পথে
ফেলে যায় ভ্রষ্টফুল ছিন্নমালা হ'তে।
প্রলাপিকা ঝিল্লির অস্পষ্ট গুঞ্জনে
বিরহ প্রলাপ তারি বনে উপবনে।
তিমির বিহ্বল এই তন্দ্রাঘাত রাতে
কম্পহীন পঞ্চবটী যুক চেতনাতে
চেয়ে আছে যেন মহাজ্ঞান সমোহিত
দেবতাত্মা, স্তম্ভিত নয়নে। অনিশ্চিত
সম্ভাবনা পানে। ঐ শুভ্র পদ্মাসনে
ধরাশায়ী কেবা ঐ ? যেন বিন্ধ্যবনে
উৎপাটিত মহীরুহ, প্রলয় ঝঞ্ঝাতে
শালপ্রাংশু দেহ তীব্র রোগ যন্ত্রণাতে
কেঁপে ওঠে। কেবা ঐ পুরুষ প্রবর ?
মৃত্যু যজ্ঞজিৎ বুঝি ভুলিয়া নখর
ছুটে আসে তার পানে করাল ভঙ্গীতে
জয় কিংবা পরাজয় সে মহাইঙ্গিতে
জানেন অন্তর্যামী। কে বলিবে আজ
বাণী সন্ত্রাসহারক পরমহংস রাজ
এই সেই তোতাপুরী।
নর্মদার তীরে
ঘুমায় ঘটিকা যার ধ্যানভঙ্গ শিরে

বয়ে গেছে বসন্তের মোহাবিল সম।
বৈশাখের রুদ্ধ বালু যার অনুপম
ধ্যান যোগ্য সুখাসন। দুরন্ত প্রাবৃষা
বহ্নি দিয়ে দিনে যার শান্তি নিক্ত নিশা।
সেই তপোধন আজ মুষ্টিত তৃতলে
তীব্র রোগ যন্ত্রণার নির্মম কবলে।
নিত্য সাথী হোমশিখা নিম্ন সন্ন্যাসীর
ধূম লেখ চক্ষে মাখি সখা সুনিবিড়
ঘেরে আছে পার্শ্বচারী অনুগত প্রাণে
উঠিছে ঝিল্লির রব অরণ্যের গানে।
শয়ন নিবন্ন তোতা আড়ষ্ট অধরে
তখনও ক্ষিপ্র বাণ বরষিত করে
"মায়া মায়া কি করিবে কৈতবিনী মায়া
সূক্ষ্মতার কুহকিনী মরীচিকা ছায়া
"অহং ব্রহ্মাস্মি" আমি মুক্ত জরা ব্যাধি
ভাঙুক মৃত্তিকা ঘট নহে সে অনাদি"।
যন্ত্রণাক্ত দেহটারে টানিয়া সবলে
বিমুক্ত কেশরী সম নিত্য ধ্যান স্থলে
বিরচিল যোগাসন চকিতে সন্ন্যাসী
ঘৃণাভরে নিয়তিরে কহে উপহাসি
"হায় মায়া এত তোর দুরন্ত পিপাসা
ব্রহ্মজ্ঞের তপোভঙ্গে কহিল উচ্চাশা!
সুদীর্ঘ দিবস গেছে সাধি মৃত্যুপণ
তোর অনিমীকা সাথে জিনিয়াছি রণ।
লভিয়াছি নির্ব্বিকল্প, তবে হাসি পায়
অনাদি অনন্ত পারে আছে নাকি হায়
আরো কিছু অন্তহীন? বোধ যোগ্য কিছু
আর কেন আর তারে ডাকিসনা পিছু
যে তোর চিনেছে রূপ।" বসিল উদাসী
সংযত করিতে চিত্তে উচ্চ অভিলাষী।
অন্ধকার ধারেনার উন্মাদ উল্লাস
মৌন অট্টহাসে যেন করে উপহাস।
সহসা শুনরি উঠি তীব্র যন্ত্রণায়
যোগ ভঙ্গে যোগীবর লুটিল ধূলায়।

চেপে গেল পদ্মাসন দৃঢ়বলীরেখে
আর্ত্ত বিহ্বলতা যেন চকিত পলকে
কুটিল ক্ষণেক তরে। এ কি অপমান!
জ্বলে ওঠে রোগক্লান্ত পাণ্ডুর নয়ান।
হয়তো ফিরিয়া চাহে চকিত নিমিখ
সম্বোধিয়া হোমানলে কহিল ঋত্বিক
"হে অমিতাশন তব আজন্ম সেবকে
খণ্ড ভাগ্য করি আর রেখোনা ভূলোকে।
মায়া সনে নিত্য রণে লভিয়াছি জয়
আজ ক্ষুদ্র দেহ কাছে এই পরাজয়?
কেমনে সহিব এই হীন অপমান?
হে হব্যবাহন কত করিয়াছি দান
হব্যাহুতি। আজ বুঝি কাল পূর্ণ হয়
বিরাট যজ্ঞের পূর্ণাহুতির সময়।
হে অগ্নিশরীরধারী পুরুষ মহান
লহ তুলে দিনু এই দেহ বলিদান।
কোথা অগ্নি? নির্ব্বাপিত বিপুল লজ্জায়
ধূমাকুলে ঢাকিয়াছে স্বাহাময় কায়।
মর্ম্মন্তিত পত্র বক্ষে আর্ত্তস্বর হানি
উঠিল শ্রীতোতাপুরী, প্রতিজ্ঞার বাণী
প্রতি অঙ্গে ফুটে ওঠে সুস্পষ্ট অক্ষরে,
কুঞ্চিত ললাটে ঘৃণা নয়নে অধরে।
বারেক দেখিল চাহি নির্ম্মম উদাস
পড়ে আছে গতিহীন মৃত কলেবর
সুবিমল চরাচর। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস
ফেলিল না ফেলে যেতে এই বিশ্ববাস।
তারপর ছুটে চলে দৃঢ় পদক্ষেপে
অচিহ্নিত অন্ধকারে চলচ্চিহ্ন রেখে
মুক্তজ্বাল জ্ঞান সিংহ।

অদূরে আহত
চন্দ্রচূড় চ্যুত গঙ্গা ম্লান ব্যথাহত।
বনান্তের পাণ্ডটানা ছায়াঞ্চল টানি
বিলুণ্ঠিত বক্ষে চাপে দীর্ণতার বাণী
বারেক ভাবিল তোতা কুঞ্চিত ললাটে

তারপর ভাগীরথীর পঞ্চমঘাটে
অবহেলে উত্তরিয়া ধীরে এসে নামি
ভাগীরথী অঙ্কগর্ভে। ভাবিল না থামি।
কে রহিল সাক্ষী এই মহা মুহূর্তের
বিলুপ্তির তমোলীন এই দিবসের
ইতিবৃত্ত কে রাখিল লিপিবদ্ধ করি।
নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী চলে ঊর্মি পথ ধরি,
সলিল সমাধি আগে পূত ভাগীরথীতে
জীবনের কর্মবিঘ্ন নিশ্চিহ্নে মুছিতে।
তট প্রহত ঢেউ করে ছলছল
অকূলের ধাত্রছানি যেন অবিরল
ডাক দেয় পথিকেরে নিয়তি ইঙ্গিতে
তন্দ্রার নিশিপট বিস্মৃত নিশীথে।
উদাসী সন্ন্যাসী চলে ধীর পদভারে
তারিছে তরঙ্গমালা স-আর্ত্ত ঝঙ্কারে।
ছুটে চলে সময়ের অতন্দ্রিত গতি
সহসা চমকি ওঠে জিত মৃত্যু যতি—
দূর—আরো কত দূর ? কোন সে অতলে
নিশ্চিন্তের শেষ কণা যেথা যাব বলে
লভিব বাঞ্ছিত মৃত্যু। একি মৈত্রী মায়া
শুকালো কি গঙ্গাবক্ষ ? কি রুদ্ধ ছায়া।
পরিব্যাপ্ত দিকে দিকে। জাগে স্বপ্ন ঘোর
অথৈ ভাগীরথীর জল আস্তরণ ঘোর ?
উত্তরিনু অনায়াসে ! দুরন্তায়া মায়া
চিরদিনই চক্ষে ঘোর রচিল আলেয়া।
ঐতো পশ্চাতে দূরে ফেলে আসা ঘাটে
চিত্রিত মন্দির শীর্ষ। তিমির ললাটে
ক্রমতারা সব জ্বলে। দেয় হাতছানি
ফেলে আসা বীচিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত বাণী।
এইতো সমুখে তৃণাঙ্কিত পরপার
জোনাকির দীপ জ্বালা সবুজ পাথার।
ওঠে ঘন কেকারব শিশিরাক্ত নিশা
নহে মৃত্যু সুপ্ত সুপ্তি তমিস্রার মিশা।
এও এক জীবনেরই তন্দ্রাচ্ছন্ন ছবি

নিশাঅন্তে শোনাবে যে আনন্দ ভৈরবী।
দুরন্তায়া মায়া আজ গঙ্গা বক্ষ হতে
ডুবিবার জলটুকু করেছে চকিতে।
দুইকূলে ঘাসে শুধু সবুজ আঁধার
শুদ্ধ তোতাপুরী দেখে অসীম কান্তার।
অকস্মাৎ হেসে ওঠে গগন ভূধর
আলোর উর্মির বক্ষে আনন্দ মধুর
একি ছবি ফুটে ওঠে মূর্ত্ত চিদাকাশে
কুটিল কি ইন্দ্রধনু বর্ণনীল হাসে।
ঘুমন্ত নীহার নদে স্বপ্নিল সুষমা
নামিল কি চন্দ্রনীল নীলান্ত জোছনা।
কারণ সাগর বক্ষ মুহূর্ত্তে মথুরি
আসিলেন মহামায়া অপরূপ ধরি।
অকস্মাৎ কণ্ঠবাসে তুলি অট্টোল্লাস
চীৎকারি উঠিল তোতা অনন্ত উচ্ছ্বাস।
মুখরিল জাহ্নবীকণ্ঠ "মা মা মা
সৃষ্টি স্থিতি স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী শ্যামা।
একি দিব্য পরকাশ কে বলে গো মায়া
চিদানন্দময়ী তুমি নহ ব্রহ্ম ছায়া।
আলোর অলকানন্দা তুমি গো জননী
অরূপের রূপ রম্যা লীলা নির্ঝরিণী"।
অনন্ত হর্ষের চেয়ে অনন্ত মধুর
সন্ন্যাসীর মরুচক্ষে আনন্দ বিধুর
দুটি ফোঁটা অশ্রু ফোটে স্বাতী বিন্দু সম
ভক্তির অধোমধীজ। আর কাস্তক্ষম
একটী প্রণাম ফোটে দুটি করপুটে
পাষাণের ফুল সম উঠেছে কি ফুটে।
সারাটি হৃদয় ঐ একটী মুঠিতে
জননীর পাদপদ্মে নিঃশেষে লুটিতে ?
জনম্বল পূর্ণ করি মহা অন্ধকারে
ফিরে আসে তোতাপুরী বিজিত গৌরবে
তরঙ্গের পদ্মদল পায়ে পায়ে ভাঙি
পঞ্চবটী মূলে যোগী দাঁড়াইল থামি।
তখনও রজনী শুদ্ধ ছায়া পথ পাশে

সুরম্য লোচনা ঐন্দ্রী হাসিছে আকাশে।
পশে যেন হোম গন্ধ নৈশ অন্ধকারে
কে করিছে চণ্ডীপাঠ অনন্ত আখরে?
দূর তপোবন হতে দেবী সুক্ত গাথা
কোন বৈশ্য প্রবর্ত্তিতা? কেবা পরিত্রাতা?

(ক্রমশঃ)

মিলিবে মিলিবে জানি নামীর দর্শন

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

বাঁচার উদ্দেশ্য যদি ঈশ্বর দর্শন,
কি দিয়ে করিবে দীন তাঁরে আকর্ষণ।
তাঁরে দেখা তাঁরে লাভ দুই কি সমান,
দেহবুদ্ধি না গেলে কি মেলে ভগবান?
কোন চোখে নেহারিব সে অরূপ রূপ,
দিব্য চক্ষু না দিলে কি রহিব নিশ্চুপ।
ধুয়ে ধুয়ে এ চোখ কি হয় না নির্ম্মল,
চোখের মণির ছায়া নিত্য কি নিষ্ফল।

চোখে না জলরে হরি উঠিবে উদ্ভাসি,
কথা না কহিলে দেখা কেমনে বিশ্বাসী।
বহু পরিচয় তব এ জানি নিশ্চিত,
পূর্ণ পূর্ণতর করে এসো পরিচিত।
আনন্দে বিভোর চিত্ত না হবে সংশয়,
আহা সব দেখা শোনা হয়ে যাবে লয়।
হঠাৎ চমকি যাও মনে হয় ভুল,
এ বিষাদস্বপ্নের শেষ কর হে নির্ম্মূল।

তুমি ত' চাওনা কিছু আমি অকিঞ্চন,
ব্যর্থ পুঁজি আমি জ্ঞান করো নিরসন।
নিজের ক্ষমতা কোথা তব কৃপা বিনা,
অন্তর না স্পর্শিলে তুমি বন্ধন টুটেনা।
কি কাজে লাগাও কারে বুঝিতে না পারি,
তুমি সর্ব্বকর্ম্মা তুমি সোবর্ণনিধারী।
বহুরূপে বিরাজ বিশ্বে, রূপ পূজা করি
হে সর্ব্বসম্ভব এসো মাতৃরূপ ধরি।

ভক্তে চাও, ভক্তি চাও, চাও ভালবাসা,
এই তব প্রয়োজন, এই মোর আশা।
কৃপা যাচে কৃপা যাচে কৃপার ভিখারী
শুধু আত্মনিবেদন শিখাও শ্রীহরি।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম শুধু তব নাম রূপ,
দীনজন দেহেমনে এই মাত্র তপ।
তব নাম নিশ্বাস হোক, নামেতে অচল,
মিলিবে মিলিবে জানি নামীর দর্শন।

রূপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। নির্জ্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়। তারপর দর্শন।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

"গুরুভগবান"

শ্রীআশাপূর্ণা

সমবেত সাধুমণ্ডলী আশ্রমের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী-বৃন্দ ভগবতী মায়েরা এবং আগত সুধী সজ্জনগণ! আজ আমরা যে মহান সন্ন্যাসীর মহাপ্রয়াণের স্মৃতিচারণবাসরে সমবেত হয়েছি, তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল "গুরুভগবান"! তাঁর দিবা জীবনের প্রতিটি তন্ত্রীরাজী সর্বদা অনুরণিত হোত ঐ মহামন্ত্রে :—"জয়তু গুরুভগবান"। তাই আজ তাঁর স্মৃতিকথার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট নাম হচ্ছে এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র "গুরুভগবান জয়তু জয়তু মম প্রাণ!"

৬ই আগষ্ট ১৯৭৯ আকাশবাণীর খবরে শুনলাম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আমাদের চির আপন চির প্রিয় চির আরাধ্য পূজ্যপাদ প্রভাকর মহারাজ আজই সকালে সিউড়ি হাসপাতালে মহাপ্রয়াণ করেছেন। খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মহাভারতে আছে যক্ষরূপী স্বয়ং ধর্ম, যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন: "পৃথিবীতে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য কি? না, 'জন্মিলে মরিতে হবে' অমর কে কোথা কবে?" এত বড় জলন্ত প্রমাণ চোখের সম্মুখে অহরহ দেখেও জীবকুল প্রস্তুত থাকে না।" কিন্তু আমাদের পরমাদর্শ সন্ন্যাসীরাজ প্রভাকর মহারাজ সকল সময়েই প্রস্তুত ছিলেন। প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। তাঁর প্রিয় ভক্ত আপন জনেরা, প্রস্তুত ছিল না তাঁর গুণমুগ্ধ আপামর জনসাধারণ। প্রস্তুত ছিল না বীরভূমের কেন্দ্র সিউড়ীর অধিবাসীরা। যে সিউড়ি সহর তাঁর ত্যাগ তপস্যার প্রভাবে আজও গৌরবান্বিত মহিমময় হয়ে রয়েছে। আমরা কখনো ভাবতে পারিনি যে তিনিও একদিন চিরাচরিত জগতের বিধান অনুসারে এ জগতের বক্ষ হতে অপসৃত হবেন। যেমন আমরা ভাবতে পারিনা যে, সূর্য্য আবার কোনদিন নিভে যেতে পারে। নীলাকাশের অনন্ত গরিমা কোনদিন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এরা যে চিরন্তন। অবশ্যই প্রভাকর মহারাজের মত সত্যসন্ধ ঋষিরা চিরন্তন হয়েই চিরকাল সূক্ষ্ম জগত হতে জগতের কল্যাণের জন্য আরও তীব্রতর শক্তি বিকিরণ করে চলবেন কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য কিছুতেই বুঝেও বোঝেনা তাঁদের সাক্ষাৎ দর্শন স্পর্শন জন্য একটা আকুলতা জেগেই থাকে। প্রভাকর মহারাজ সন্ন্যাস জীবনেও যেমন আমার অগ্রজ—পূর্বাশ্রমেও তিনি আমার বড়ই গর্ব্বের ও আদরের দাদা ছিলেন। তাঁর পূজনীয়া মাতৃদেবী—ভাগলপুর সহরে—বিহারে আমার পিতৃগৃহেই বড় হয়েছিলেন এবং ভাগলপুর হতেই তাঁর বিবাহ হয় বাতিকারের ধনী জমিদার ঘোষ পরিবারে। মানুষে সংসার জীবনের কাম্য হিসাবে যা কিছু প্রার্থনা করে, তার সবই প্রভাকরদার ছিল। ছাত্রজীবনে তিনি প্রতিভাদীপ্ত ছাত্র ছিলেন। ওকালতি পাশ করে সিউড়ি বারে অল্প সময়ের মধ্যেই নাম করেন। পূর্বাশ্রমের পিতা পিতামহের বংশ ছিল—গৌরাঙ্গ পার্ষদ বাসুদেব ঘোষের বংশ। যে বাসুদেব ঘোষ গৌরাঙ্গদেবের সাতপ্রহরিয়া মহাভাবের সময় প্রভু কর্তৃক বর চাইতে আদিষ্ট হয়ে সজল নয়নে মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। "জগতের যত প্রাণী আছে সকলের পাপভার আমাকে দাও। দিয়ে প্রভু তুমি তাদের মুক্ত করে দাও।" আর তাঁর মাতৃদেবী যিনি পূর্বাশ্রমে আমারও মাতৃস্বরূপা পিসীমাতা ছিলেন—তিনি যেন ছিলেন, ধর্মরূপিনী সাক্ষাৎ ভগবতী। একবার একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী প্রভাকর মহারাজের ভাগ্য গণনা করে বলেছিলেন, "আপনার মাতৃভাগ্য অতুলনীয়। আপনার মাতৃদেবীতে ভগবতীর পূর্ণ অংশ রয়েছে।" সে কালের ধনী জমিদার গৃহের প্রথামত তাঁর তরুণ বয়সেই বিবাহ হয়। একটি সর্বগুণসেত পুত্রসন্তান এবং একটি মেয়ের

পূজনী করা হয়। কোন দিকেই কোন অপূর্ণতা ছিল না। কিন্তু মাত্র ২৩।২৪ বছর বয়সে, যখন মানুষের ভরা ভোগের সময় তখন থেকেই তাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্য জেগে ওঠে। গতানুগতিক ভোগ আবিলতাময় ক্ষণিক সংসার সুখে তৃপ্ত না হয়ে জীবনের গভীরে যে অধ্যাত্ম অতল আহ্বান আছে তারই খোঁজে তিনি অশান্ত হয়ে ওঠেন। সেই যে দ্রষ্টা ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—"যে শুনেছে কানে তাঁহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে।

সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে ফিরেছে সে বিশ্ব বিসর্জন।
সর্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন।
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে ঘোর হুতাশন
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন, রক্ত পদ্ম অর্ঘ্য উপহারে"

তিনি কে ? যাঁর আরক্ত শতদল সম চরণতলে প্রভাকর মহারাজ নিজের যথাসর্বস্ব সঁপে দিয়ে তৃপ্ত হন, ধন্য হন, মুক্ত হন। তিনি তাঁর গুরু—আমাদের গুরু—এক কথায় বলতে গেলে জগদ্‌গুরু, এযুগের যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অভিন্ন কলেবর ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব। ছোট থেকেই প্রভাকরদা আমাকে খুব স্নেহ করতেন কারণ আমাদের ভাইবোনের মনের গঠন অনেকটা একই রকম ছিল এবং জীবনের আদর্শও অভিন্ন ছিল। যখন প্রভাকরদা তখনও ওকালতী একেবারে ত্যাগ করেননি—বাইরের ঠাটটি বজায় রেখেছেন কিন্তু চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—দুঃখার জল, জীবনের শান্তি, তখনও ঠাকুরের সঙ্গে প্রকটরূপে পরিচয় হয়নি—কিন্তু তাঁরই পানে কি এক অলক্ষ্য ইঙ্গিতে যেন অগম অভিসারে চলেছেন। তখন তিনি কোর্টের কাজে প্রায়ই দুবরাজপুরের কাছারিতে আসতেন এবং আমাদের তখনকার গৃহাশ্রমে এসে অতিথি নারায়ণরূপে থাকতেন। তখন তাঁর এই পথ খুঁজে বেড়াবার ইতিহাস —তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের নানা নিগূঢ় উপলব্ধি, নিরালায় কাজের অবসরে বসে আমাকে বলতেন। ছাত্রজীবন হতেই হোস্টেলে তাঁরঘরে ক্র্যাক ডোরাকের আঁকা ধ্যান মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি টাঙ্গানো ছিল। হয়তো কোন-দিন ইচ্ছা হলে ছবিতে একটা প্রণাম করতেন। আবার মনে না থাকলে করতেনও না। কিন্তু ভগবান কখন যে কাকে কীভাবে বরণ করে নেন—তার তো কোন পূর্বাপর নেই। তাইজন্য শ্রুতিতে বলেছেন:—

"যমেবৈষ বৃণুতে।
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

তিনি যাঁকে বরণ করে নেন—সেই কেবল পায় আত্মার আত্মাকে কিন্তু সেই আত্মবিস্মৃত, উপেক্ষাভাবে টাঙ্গানো ভগবান রামকৃষ্ণের ছবিটি থেকেই প্রভাকরদা প্রথম দেখেছিলেন—ঠাকুর ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক এবং অভিন্ন। তারপরে তো শ্রীশ্রীসারদা মা'র কথা—

"যে মার, সে তার।
যুগে যুগে অবতার"।

প্রভাকর মহারাজ যুগ যুগান্তর হতে নির্দিষ্ট তাঁর আপন স্থানটিতে এসে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন শ্রীঠাকুরের চরণোপান্তে। ঠাকুরের সেই প্রথম আত্মপ্রকাশের উষার উষয়ক্ষণ হ'তেই প্রভাকরদা গুরু সেবাসক্তী। তিনি ছোট ছেলেটির মত করেই ঠাকুরের সেবা করেছেন নাইয়েছেন—খাইয়েছেন। তখন কে শালা আর কে প্রতিপালক—যেন মায়ে মাকেই ধুয়ে মুছে যেত। আর সত্যিই যে তাই। গুরু শিষ্যের এই অভিনব সম্পর্ক নিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"কখনো ভগবান হ'ন চুম্বক আর ভক্ত হ'ন সূঁচ। আবার কখনো ভক্তই চুম্বক হয়ে দাঁড়ান। ভক্ত কি কম গা

তখন হতেই শ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় চিরজনমের মত অচ্ছেদ্য। গুরু শিষ্য যে "একই বৃন্তের" দুটি পারিজাত পুষ্প। শিষ্যেরও মহিমা কিছু কম নয়। তাই একটি কথা আছে আমাদের শাস্ত্রে:—

"গুরু মিলে লাখ লাখ
তো চেলা না মিলে এক।"

একথা কেন বলেন শাস্ত্রে ? স্বামী বিবেকানন্দ তার উত্তরে বলে গেলেন "জ্ঞাতা কখনো নিজেকে জানিতে পারেনা।"

"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" বৃহদারণ্যক-উপনিষদ ৪।৫।১৪। সেই আত্মা যিনি জ্ঞাতা ও সকলের প্রভু, যিনি প্রকৃত বস্তু, তিনি জগতের সমুদয় সৃষ্টির কারণ, কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রতিবিম্ব ব্যতীত নিজেকে দেখা

নিজেকে জানা অসম্ভব। আর সেই প্রতিবিম্ব হইল ভক্ত।"
—বিবেকানন্দ

ভক্ত নইলে ভগবানের প্রকাশ হ'তো কেমন করে। তাঁকে স্বাচির করতো কে? তাইজন্তে আধারের মহিমা আধেয়ের অপেক্ষা কম নয়। ভক্ত নইলে তিনি যে আছেন একথাই প্রকাশিত হ'তোনা। ভগবানেরও সাধ্য নাই ভক্ত হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত রূপ ছাড়া নিজ রূপ দর্শন করেন। তাই জন্তে তিনি যুগে যুগে বলে গেছেন: "তোমারই সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি চিনি আপনারে।" —রবীন্দ্রনাথ

ভগবানের বিপুল শক্তি বিপুল ঐশ্বর্য ত্রিভুবন নাথ তিনি। কিন্তু এদিকে আধার নিয়ে তিনি বিস্ময়ভরে ভক্তের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বলছেন:—

"মোর মুকুলার ললাটফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব?
হে আমার চির ভক্ত!
একি সবই সত্য?" —রবীন্দ্রনাথ

এ যুগের কল্পতরু মহাসাধক পুরুষোত্তম ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেবও যেন ছোট শিশুর মত সেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশের ক্ষণে প্রভাকর মহারাজের সেবা গ্রহণ করতেন। প্রভাকরদাও সন্ন্যাস নিয়ে একেবারে গুরুসেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। ঠাকুরই একদিন আমাকে বোঝা-ছিলেন: 'সন্ন্যাস মানে গুরু চরণে সম্যক ন্যাস। এই তার একমাত্র সংজ্ঞা। ঐ যে বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি পদ আছে—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে,
গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর"

এই অবস্থা "সন্ন্যাস না হলে লাভ হয় না"

প্রভাকরদাকে প্রত্যক্ষ করেই আমি ঐ বাণীর মানে বুঝতে পারতাম। তাঁর দেহ মন চিত্তচলন প্রতি স্নায়ুশিরাতন্ত্রী সমস্তই যেন তাঁর গুরু ভগবানের সুরে বাঁধা হ'য়ে গেছিল। খাওয়া পরা শয়ন গমন বিশ্রাম সমস্তই তাঁর ঐ একজনের চরণে বাঁধা। পূর্বেই বলেছি স্নেহভরে তিনি প্রায়ই আমাদের তখনকার দুবরাজপুরের গৃহাশ্রমে যেতেন। বিশেষ করে তখন দুবরাজপুর আশ্রম সবে গড়ে উঠছে এবং তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা সে আশ্রমের। আর ডাঃ চিন্ময়ানন্দ স্বামীও তাঁকে খুব সাহায্য করতেন। আমাদের কাছে এসে তিনি কি গ্রহণ করবেন—কি নিবেদন করবেন তাও নিজে থেকে বলতে পারতেন না—উপরের আলো যেমন ভাবে এসে পড়বে; সেটি বর্ণমালার কোন অক্ষর কয়েকটি নিয়ে লটারী করে নির্ণয় করতেন। এ সবের মানে সবাই বুঝতে পারতোনা। যাঁদের একেবারে উৎসর্গীকৃত জীবন—প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রতিটি নিমেষ উন্মেষ একজনের চরণে নিবেদিত তাঁদের ক্রিয়া মুদ্রা সাধারণ লোকে কি বুঝবে। একটু হাসাহাসি হোত—সিউড়ি আশ্রমের সবাই নাকি ফ্যানাটিক্ (fanatic)! শুনে আমার খুব কষ্ট হোত—একদিন শ্রীঠাকুরের কাছে দুঃখের কথা নিবেদনও করে ফেললাম। নির্মল প্রসন্ন হাসে শ্রীঠাকুরের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বল্লেন, "বলুকগে। ফ্যানাটিক্ হওয়া কি সোজা মনে কর? এই আমাদেরই আশ্রমে ক'জন ফ্যানাটিক্ আছে? এক ফ্যানাটিক্ প্রভাকর—সমস্ত কিছু পুড়িয়ে না ফেললে কি ফ্যানাটিক্ হওয়া যায় নাকি? প্রভাকরকে তো তুমি জান। আর এক ফ্যানাটিক্ মানিক (বর্তমান সঙ্ঘপতি স্বামী নির্বেদানন্দ)। ও আবার কতদূর ফ্যানাটিক্, শোন না। বেশ মাথা কামিয়েছে। যে নতুন লোক আশ্রমে আসছে আমি তাকেই বলছি মানিককে দেখিয়ে—"এই দেখুন একজন খুব বড় গণৎকার। হাতটা একবার দেখিয়ে নিন না। চুলকায়, মাথা নেড়া, ঠিক গণৎকার গণৎকার চেহারা। মানিকও অমনি হাসি হাসি মুখে "হ্যাঁ ঠাকুর এই দেখে দিই" বলে হাত দেখতে বসে পড়ল। আর একদিন ভর্তি অবাবস্থার দিনে বলছি—মানিক! আজ যে পূর্ণিমা। জানতো! মানিকও অমনি হ্যাঁ ঠাকুর 'আজ চাঁদ উঠলে খুব জ্যোৎস্না পাওয়া যাবে'। এত বড় বড় সব জ্ঞানী গুণী লোক কিন্তু ওদের নিজের বলতে আর কিছু নেই। ফ্যানাটিক্ হওয়া কি মুখের কথা। লোকের বলায় দুঃখ কর কেন? আমি শ্রীঠাকুরের মুখের দিকে অবাক হয়ে

তাকিয়ে রয়েছি—এ যুগের এই যুগাবতার কত সহজে কত বড় তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিলেন। সত্যি, জীবনের প্রতি অণু পরমাণু একজনকে নিবেদিত করে দিয়ে ফ্যানাটিক্ হওয়া যে কী বস্তু প্রভাকরদার জীবনে তা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছি। একদিন দুবরাজপুরের আশ্রম সঞ্চারের উদ্যোগ আয়োজন করতে একটু অধিক বেলাতে অনেক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী কর্মী তথায় শুভাগমন করেছেন। তখন চাল ভিক্ষা নিয়ে গিয়ে রান্নাবান্না করবার সময়ও নাই আর তাছাড়া তখনকার দিনের দুবরাজপুর আশ্রমে উপকরণ বলতে কিছুই ছিল না, কেবল ধূ ধূ করা শ্মশান প্রান্তরের কিনারায় আশ্রমের মাঠ আর ২।১ খানি ঘর ছাড়া। প্রভাকরদা বিরাট এক হাঁড়িতে সমস্ত রকম আনাজ দিয়ে আমাকে দিয়ে জলখিচুড়ি রাঁধালেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসীরা অপেক্ষারত, না জানি কত বেলা হয়েছে, তখনও উনুনে টগবগ্ করে ফুটছে খিচুড়ি, সবেমাত্র সুসিদ্ধ হয়েছে। সেই জলন্ত খিচুড়ির হাঁড়ি তিনি মাথায় তুলে নিলেন। এক চাপ খিচুড়ি উথলে উঠে তাঁর একটা গাল পুড়িয়ে দিল। আমাদের হায়! হায়। আক্ষেপের উত্তরে প্রভাকরদা যন্ত্রণাহীন শান্ত মুখে বললেন, "একমাত্র ঠাকুর ছাড়া প্রভাকরকে আর কেউ পোড়াতে পারেন না। নিশ্চয়ই আমারই কোন প্রারব্ধের ভোগ ঠাকুর লঘু করে দিচ্ছেন। তুমি কি তা নিবারণ করতে পারবে?"—এই না বলেই বিরাট আগুনের মত গরম খিচুড়ির হাঁড়ি মাথায় নিয়ে দৃপ্ত পদে মেড় মাইল দূরের আশ্রমের পথে পাড়ি দিলেন। গীতামুখে শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যুগের প্রয়োজনে তিনি নব নব রূপে "সম্ভবামি যুগে যুগে।" নিশ্চিতই এ যুগে নারীজাতির অভ্যুদয় ঘটবে। তাদের অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখা আর চলবে না। রবীন্দ্রনাথের ছন্দের সুরে তারা তাই বলছে :—

"যেথা যদি দূরে সরায়ে রাখিবে মোরে
আমি তাও নহি।
আমার সকল বাণী অবহেলে ঠেলিবে মোরে
আমি তাও নহি।
যদি সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে পাশে রাখ মোরে
তবে মোর পাবে পরিচয়—"

তাই স্বামী বিবেকানন্দের মেঘমন্দ্র সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠছে :—

"দাদা! ঠাকুরকে যদি না বুঝে থাক—দোষ দিইনা। কিন্তু মা ঠাকরুণকে যে না বুঝেছে—তার কিছুই হবেনা। নৈব নৈব চ। তাই আজ আগে স্ত্রীমঠ। আগে মায়ের মেয়েরা তার পর অন্য সব।"

প্রভাকরদাও ঠাকুরের চরণে একা আসেন নি। সহধর্মিণী অর্পনা মা, অর্পণাপুরী—পুত্র স্বামী বিমলানন্দ, কন্যা মহামায়াপুরী সবাই তাঁর সঙ্গে এসে ঠাকুরের চরণে—মিশেছেন। এটিও আমাদের এ যুগের ঠাকুরের একটি বিশেষ দান। দুই পথেই তাঁর দিকে যাওয়া যায় :—"নেতি নেতি কিরণ"—নেতি নেতি করে সবাইকে ত্যাগ করে, এ নয় এ নয় বলে—negative দিক। আবার, "অস্তি ভাতি প্রিয়"। তিনি আছেন বলে তাঁরই অস্তিত্বে সবাই অস্তিত্ববান। তাঁরই প্রিয়তায় সবাই প্রিয়। positive দিক। পুত্রকে ত্যাগ করবে কেন? পৃথিবীর সবাই তোমার পুত্র হোক—তাইকে ছাড়বে কেন? —সবাই যে তোমার ভাই। একটি নির্দ্দিষ্ট ঘর কেন তোমার হবে? বিশ্বের সব গৃহই যে তোমার গৃহ। আমাদের ঠাকুর পজিটিভ্ দিকই ভালবাসতেন :—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।"

ভাইদের আমাদের ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে নারীকে নরকের দ্বার বলে সংসার ত্যাগ করে পালাবার দরকার হয় না। সমস্ত সংসারটাই তাঁর চরণ-ছায়ে নেমে এসে ঠাকুরঘর হয়ে যায়। পালাবে কার কাছ থেকে এবং কেনই বা পালাবে! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামত স্ত্রী তখন বিদ্যাশক্তি হয়ে এসে স্বামীকে আরও এগিয়ে দেন ভগবানের দিকে। প্রকৃতই সহধর্মিণী হ'ন তিনি তখন

যেমন হ'য়েছিল প্রভাকরদার বেলায়। তার ২৪।২৫ বছর বয়সে ভরা ভোগের সংসারে তিনি সর্ব্বত্যাগী হয়ে শ্রীঠাকুরের চরণে চলে আসেন। সহধর্মিণী অপর্ণামাও তৎক্ষণাৎ দু'টি ছোট ছোট শিশু নিয়ে স্বামীর পথ অনুসরণ ক'রে আশ্রমে চলে আসেন এবং শ্রীঠাকুরের ও আশ্রমের সেবায় তনমনপ্রাণ অর্পণ করেন। সন্ন্যাস নিয়ে তাঁর নাম হয় অর্পণাপুরী। শ্রীঠাকুরের সেই প্রথম আত্মপ্রকাশের মহালগ্নে নীরব নির্জ্জন আশ্রমে প্রভাকরদা হ'ন ঠাকুরের নিত্য সেবাসঙ্গী সমস্ত দিন রাত্রি ব্যেপে। তখনতো আর এত উপকরণ ছিল না। হয়তো বালিতে কয়েকটি আলু পুড়িয়ে দিচ্ছেন। কাঁচা চিনে বাদামগুলি একটু সেঁকে দিচ্ছেন। দশ পয়সা নিত্য বরাদ্দের ছোম ও ভোগের জিনিষগুলি একটু গুছিয়ে দিচ্ছেন। গুরুর সঙ্গে তিনি এমনই একপ্রাণ হ'য়ে গেছিলেন, যে, তখনকার দিনের একটি দিবা ছবি মনে জেগে উঠছে :—তখনকার দিনের লিঙ্গেড়ি আশ্রম তখনো পুরোটা গড়েই ওঠেনি। একতলায় একটি টানের ছোট ঘরে শ্রীঠাকুর হোম করে উপরে চলে যেতেন। প্রভাকরদা ও তাঁর সহধর্মিণী সেবার কাজ নিয়ে সর্বদা কি দরকার দেখতেন। সেদিন শ্রীঠাকুর হোম শেষে উপরে উঠে গেছেন যথারীতি। হোমের অগ্নি-কুণ্ডের পাশেই ছোট একটি কম্বলে প্রভাকর মহারাজ সারা-রাত্রি জাগরণের পর একটু শয়ন করে রয়েছেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রার ঘোরেই বলে উঠলেন—"যাই ঠাকুর—আজ যাই। চললাম।" অর্পণা মা পাশের হোমের জায়গা পরিষ্কার করছিলেন—কাঠগুলি গুছিয়ে রাখছিলেন—তিনি বললেন "তোমাকে তো ঠাকুর ডাকেননি। আমি তো জেগে কাজ করছি—ডাকলে কি শুনতে পেতাম না! সারারাত্রি জেগে রয়েছ আর একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও।" প্রভাকরদা কোন কথায় কর্ণপাত না করে উপরে ছুটলেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুর বলেন—"এই যে প্রভাকর! বড় ঘুমন্ত পেয়েছে একটু জল দেবে!"

এই তমোহর কলিযুগে সন্ন্যাসের যা আদর্শ—প্রভাকর মহারাজ আপন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তা মেলিয়ে গেছেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের নিকট ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছিলেন—ত্যাগ পথের আদর্শ কী! যদি একটু জানতে পারতাম। যদি একটু বলে দিতেন। গৌরাঙ্গদেব একটু হেসে বলেন, "আমি তো নিজে বড় একটা কিছু বলিনা কাউকে। তোমাকে স্বরূপের হাতে দিয়েছি, সেই বলে দেবে সব।

"তথাপি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা যদি হয়,
এই আমি কহিনু তোমায় করিয়া নিশ্চয়।
ভালো না খাইবে আর ভালো না পরিবে।
গ্রাম্যকথা না কহিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।"

মহাপ্রভুর এই আদেশের মূর্ত্তিমতি প্রকাশ রঘুনাথের মত প্রভাকরদাও ছিলেন। আর ঠাকুরের কী অপার প্রেম ছিল প্রভাকর মহারাজের উপর। শ্রীঠাকুর যখন যা বলতেন—সব আমি রূপণের ধনের মত সযত্নে মনের মণি-কোঠায় সঞ্চয় করে রাখতাম। ঠাকুর আবার মহাপ্রভুর মত সন্ন্যাসের কঠোর আদর্শ বলে দিয়েও কিন্তু পাঁচসিকে পাঁচআনা "মা" ছিলেন বলে বেদনার্ত্তও হতেন। একদিন আমি একটু ছেঁড়া কাপড় পরে তাঁর চরণপ্রান্তে গেছি। তিনি বলেন:—"ছেঁড়া কাপড় পরে এসনা মা। জানি সাধুদের বাইরের বেশভূষার পরিচয় অবান্তর। কিন্তু তোমরাতো আমার ছেলেমেয়ে। তোমাদের পরিচয় অভাবে, বাইরের জগতে অবাঞ্ছিত অপমান চলে আমার মনে লাগে। শোন তবে বলি, প্রভাকর আগে আরও ঐ রকম রুক্ষ কঠোর সন্ন্যাসী ছিল। নিজের গেরুয়া আধময়লা চাদরের খুঁটেই হয়তো চা ছেঁকে ছে। খেয়ালও নেই। ঐ চাদরই গায়ে দিয়ে চললো বড় বড় অফিসার মহলে। আর তখন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে—সেক্রেটারিয়েটে নানা জায়গায় নানা প্রয়োজনে আশ্রমের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে যেতেও হোত। একদিন ঐ দীনাতিদীন বেশে যাচ্ছে, এক বড় বিল্ডিংয়ের সামনে এক দারোয়ানজী পৌচান্তে হাতের মগের বাকী জলটাই তার দিকে ছুঁড়ে দিলে। আর আজ কালকার সমাজে সাধুর পরিচয় কি? আগে লোকে বলতো ক'হাজারী সাধু? তার মানে সেই সাধু যিনি কতহাজার রূপে সিদ্ধ। আর আজ যে প্রতিষ্ঠানের যত হাজার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স

যেমন হ'য়েছিল প্রভাকরদার বেলায়। তার ২৪।২৫ বছর বয়সে ভরা ভোগের সংসারে তিনি সর্ব্বত্যাগী হয়ে শ্রীঠাকুরের চরণে চলে আসেন। সহধর্মিণী অর্পণামাও তৎক্ষণাৎ দু'টি ছোট ছোট শিশু নিয়ে স্বামীর পথ অনুসরণ ক'রে আশ্রমে চলে আসেন এবং শ্রীঠাকুরের ও আশ্রমের সেবায় মনপ্রাণ অর্পণ করেন। সন্ন্যাস নিয়ে তাঁর নাম হয় অর্পণাপুরী। শ্রীঠাকুরের সেই প্রথম আত্মপ্রকাশের মহালগ্নে নীরব নির্জন আশ্রমে প্রভাকরদা দু'জন ঠাকুরের নিত্য সেবাসঙ্গী সমস্ত দিন রাত্রি ব্যেপে। তখনতো আর এত উপকরণ ছিল না। হয়তো বালিতে কয়েকটি আলু পুড়িয়ে দিচ্ছেন। কাঁচা চিনে বাদামগুলি একটু সেঁকে দিচ্ছেন। দশ পয়সা নিত্য বরাদ্দের হোম ও ভোগের জিনিষগুলি একটু গুছিয়ে দিচ্ছেন। গুরুর সঙ্গে তিনি এমনই একপ্রাণ হ'য়ে গেছিলেন, যে, তখনকার দিনের একটি দিবা ছবি মনে জেগে উঠছে :—তখনকার দিনের সিউড়ি আশ্রম তখনো পুরোটা গড়েই ওঠেনি। একতলায় একটি টিনের ছোট ঘরে শ্রীঠাকুর হোম করে উপরে চলে যেতেন। প্রভাকরদা ও তাঁর সহধর্মিণী সেবার কাজ নিয়ে সর্বদা কি দরকার দেখতেন। সেদিন শ্রীঠাকুর হোম শেষে উপরে উঠে গেছেন যথারীতি। হোমের অগ্নি-কুণ্ডের পাশেই ছোট একটি কম্বলে প্রভাকর মহারাজ সারা-রাত্রি জাগরণের পর একটু শয়ন করে রয়েছেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রার মধ্যেই বলে উঠলেন—"যাই ঠাকুর—আজ্ঞে যাই। চললাম।" অর্পণা মা পাশের হোমের জায়গা পরিষ্কার করছিলেন—কাঠগুলি গুছিয়ে রাখছিলেন—তিনি বললেন "তোমাকে তো ঠাকুর ডাকেননি। আমি তো জেগে কাজ করছি—ডাকলে কি শুনতে পেতাম না! সারারাত্রি জেগে রয়েছ আর একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও।" প্রভাকরদা কোন কথায় কর্ণপাত না করে উপরে ছুটলেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুর বলেন—"এই যে প্রভাকর! বড় ঘুম পেয়েছে একটু জল দেবে!"

এই তমোযুত কলিযুগে সন্ন্যাসের যা আদর্শ—প্রভাকর মহারাজ আপন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তা দেখিয়ে গেছেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের নিকট ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছিলেন—ত্যাগ পথের আদর্শ কী! যদি একটু জানতে পারতাম। যদি একটু বলে দিতেন। গৌরাঙ্গদেব একটু হেসে বলেন, "আমি তো নিজে বড় একটা কিছু বলিনা কাউকে। তোমাকে স্বরূপের হাতে দিয়েছি, সেই বলে দেবে সব।

"তথাপি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা যদি হয়,
এই আমি কহিনু তোমায় করিয়া নিশ্চয়।
ভালো না খাইবে আর ভালো না পরিবে।
গ্রাম্যকথা না কহিবে, গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।"

মহাপ্রভুর এই আদেশের মূর্ত্তিমতি প্রকাশ রঘুনাথের মত প্রভাকরদাও ছিলেন। আর ঠাকুরের কী অপার প্রেম ছিল প্রভাকর মহারাজের উপর। শ্রীঠাকুর যখন যা বলতেন—সব আমি রূপণের ধনের মত সযত্নে মনের মণি-কোঠায় সঞ্চয় করে রাখতাম। ঠাকুর আবার মহাপ্রভুর মত সন্ন্যাসের কঠোর আদর্শ বলে দিয়েও কিন্তু পাঁচসিকে পাঁচআনা "মা" ছিলেন বলে বেদনার্তও হতেন। একদিন আমি একটু ছেঁড়া কাপড় পরে তাঁর চরণপ্রান্তে গেছি। তিনি বলেন:—"ছেঁড়া কাপড় পরে এসনা মা। জানি সাধুদের বাইরের বেশভূষার পরিচয় অবান্তর। কিন্তু তোমরাতো আমার ছেলেমেয়ে। তোমাদের পরিচয় অভাবে, বাইরের জগতে অনাদর অপমান চলে আমার মনে লাগে। শোন তবে বলি, প্রভাকর আগে আরও ঐ রকম রুক্ষ কঠোর সন্ন্যাসী ছিল। নিজের গেরুয়া আধময়লা চাদরের খুঁটেই হয়তো চা ছেঁকেছে। খেয়ালও নেই। ঐ চাদরই গায়ে দিয়ে চললো বড় বড় অফিসার মহলে। আর তখন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে—সেক্রেটারিয়েটে নানা জায়গায় নানা প্রয়োজনে আশ্রমের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে যেতেও হোত। একদিন ঐ দীনাতিদীন বেশে যাচ্ছে, এক বড় বিল্ডিংয়ের সামনে এক দারোয়ানজী পৌচাতে হাতের মগের বাকী জলটাই তার দিকে ছুঁড়ে দিলে। আর আজ কালকার সমাজে সাধুর পরিচয় কি? আগে লোকে বলতো ক'হাজারী সাধু? তার মানে সেই সাধু কিনে কতহাজার গুণে সিদ্ধ। আর আজ যে প্রতিষ্ঠানের যত হাজার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স

শরীরের এ অবস্থায় আপনার একা যাওয়া উচিত নয়। যে সেবকটি সঙ্গে থাকত, তাকে প্রায়ই বলতেন "৫।৬ই আগস্টের পর আর আমার সেবার দরকার থাকবে না।" সে মনে করতো তাহলে বুঝি আর তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। ক্রমেই সবল হয়ে উঠবেন। পথ চলবার সময় একজন কেউ তাঁর সঙ্গে থাকবে, তাঁকে ধরবে বললেই তিনি বলতেন, "তোমরা কেউ ধরলে ঠাকুর তো আর ধরবেন না। একাই যাব আমি।"

দুবরাজপুর আশ্রম হবার পর যতদিন তাঁর শরীরে শক্তি ছিল, সিটিটির থেকে প্রতিদিন যাতায়াত করে ছেলে-গুলিকে পড়াতেন, সযত্নে অন্যান্য শিক্ষা দিতেন। বাস থেকে নেমে রোজ হেঁটে আশ্রমে যেতেন। কোনদিন শত অনুনয়েও একটা রিক্সা করেননি। সন্ন্যাসী আবার নিজের দেহের আরামের জন্য অর্থ অপব্যয় করে বুঝি? এই তাঁর উত্তর ছিল। তারপর ক্রমেই এগিয়ে এল ১৯৭৯ এই আগস্ট, ঠিক দশ বছর আগে শ্রীঠাকুর এই দিনে মহাপ্রয়াণ করেন। শ্রাবণ যেন বিরহের মাস। শ্রাবণের শেষদিনে রামকৃষ্ণদেব মহাপ্রয়াণ করেন।

এই আগস্ট তাঁর মরজীবনের শেষদিন। এই মহা ভিক্ষু চললেন ভিক্ষা করতে এর কয়েকদিন আগে দুবরাজপুর। কেন ভিক্ষা, কিসের জন্য ভিক্ষা কাউকে বললেন না। কাউকে সঙ্গে নিলেন না। দুবরাজপুর বাস স্ট্যাণ্ডে নেমে একাই হেঁটে চললেন আশ্রম অভিমুখে। একটা রিক্সাও নিলেননা। দুর্বল শরীর মাথাঘুরে হয়তো পড়ে গেলেন—পিছন থেকে একটা রিক্সা এসে ধাক্কা দিলে। শেষক্ষণেও আনন্দস্মিত মুখে চিকিৎসারত ডাক্তারদের আশীর্বাদ করে করজোড়ে বললেন:—

"আহা ঠাকুর বলে গেছেন—শিবজ্ঞানে নারায়ণ! এরা কি কম গো।"

একই দিনে ঠাকুরের যেদিন লীলাসংবরণ হয়—দশ বছর আগে সেই একই দিনে তিনিও এপারের লীলা শেষ করে তাঁর সঙ্গে চিরদিনের মত মিশে গেলেন। তাঁর জীবন মরণ সবই যেন এক সূত্রে তাঁর গুরু ভগবানের সঙ্গে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে মনে :—

"মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়॥
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল।
আজি বিরিল তোমার পদতল॥
মোর আনন্দ সে যে মনিহার।
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়॥
মোর রাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়॥
মোর বৈর্য্য তোমার রাজপথ।
সে যে শক্তিবে বন পর্ব্বত॥
মোর বীর্য্য তোমার জয় রথ।
তোমারই পতাকা শিরে বয়॥"

প্রভাকর মহারাজের স্মৃতি তর্পণ এই সাধু সম্মেলনে করতে পেরে আমি ধন্য এবং কৃতার্থ। তাঁর গুরু ভগবান আমাদের গুরু ভগবান। শ্রীঠাকুর আশ্রমের যে কোন বড় উৎসবে যখনই সাধু সম্মেলন হোত—করজোড়ে দীনাতিদীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ভাগবতে ভগবান বলে গেছেন :

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্।
সাধূনাং হৃদয়ত্বহম্॥
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।"

সাধুদের হৃদয় আমার হৃদয় এবং আমার হৃদয় সাধুদের হৃদয়। তাঁরাও আমাকে ছাড়া কিছু জানেন না আমিও তাঁদের ছাড়া কিছুই জানি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন :—"ভক্তের হৃদয়, সাধুদের হৃদয় যেন ভগবানের বৈঠকখানা।"

সাধু সম্মেলনের এই পরম শুভ মুহূর্তে তাঁর আশীর্বাদে সকল আয়োজন পূর্ণ পূর্ণতম হোক। তাঁর আশীর্বাদে আমরা গুরুচরণাশ্রিত হই।

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।
ওঁ ভগবতে শ্রীশ্রীসত্যানন্দায় নমো নমঃ॥

প্রভাকর মহারাজের পুণ্য আত্মার বিষয়ে সাধু সম্মেলনে এটী লেখিকা কর্তৃক পঠিত হয়।

শ্রবণ-মঙ্গলম্

সাধনাপুরী

২রা জুন ১৯৮২

আজ অমাবস্যার হোমে চার ঘণ্টা একাসনে হোম-বেদীতে বসলে শ্রীঠাকুরের কষ্ট হবে, ধ্যানের অসুবিধা হবে সেজন্য আমি পশ্চিমের বারান্দায় আলাদা করে চার ঘণ্টা হোম করলাম—শ্রীঠাকুর অন্যদিকে একাসনে বসলেন—কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। যথারীতি উপনিষদ পাঠ, আরতি ভজন সারা হলে চার ঘণ্টারও বেশ কিছুক্ষণ পরে শ্রীঠাকুর চোখ মেলে চাইলেন—ও হোমের পূর্ণাহুতি হল। এদিকে বেশ কিছুক্ষণ হল ডাক্তার সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী এসে বসে আছেন শ্রীঠাকুরের Pressure দেখবেন বলে। পূর্ণাহুতির পর শ্রীঠাকুর বললেন—ডাক্তার বাবুও প্রণাম করে কিছুক্ষণের মধ্যেই Pressure দেখলেন—এই কয়দিন ওষুধ খেয়ে যা কমেছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে গেছে। গভীর ধ্যানের ফলে মাথায় খুব রক্ত উঠেছে ও সমস্ত শরীরটাই up set হয়ে রয়েছে—ডাক্তার বাবু বললেন, আবার দুদিন বাদে এসে দেখে যাবো। এখন তো বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কত Pressure; ডাক্তারবাবু প্রণামান্তে প্রসাদ ও আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে গেলেন।

শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে গোপালবাবু, বিজয়বাবু, গোলক, নিরঞ্জন, মদন গুপ্ত, সুনীলবাবু বসে আছেন।

নিত্যদিনের মত প্রার্থনা মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র, গুরুবন্দনা ইত্যাদি হয়ে যাবার পরে কথামৃত পাঠ সুরু করলেন—ওদিকে হোম-বেদী থেকে অখণ্ড নাম ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে শ্রীঠাকুরের চোখ মুখের ভাব অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

কথামৃত পাঠের পরে ভক্ত সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন।

শ্রীঠাকুর—(সকলের প্রতি) Dream theoryর Pragmatic Value আছে, এটা নিয়ে পাশ্চাত্য Psychologyতে বেশী একটা কিছু বলা নাই—এ সম্বন্ধে একটা আমার মনে হয় যে dream এর একটা Pragmatic Value আছে—কোন dream অর্থাৎ স্বপ্ন দেখলে সেটার একটা self studyর দিক খুলে যায়, Ethical value, moral value এসব দিয়ে নিজেকে analysis করা—কেননা স্বপ্নের মধ্যে এ সব প্রয়োজনীয়তা আছে—স্বপ্ন সব সময় এলোমেলো নয়—স্বপ্নের একটা প্রয়োজনবাদ, ব্যবহারিক দিক আছে। স্বপ্ন দেখলে আর লিখে লিখে রাখতে লাগলে—যখন কোন একটা অসৎ স্বপ্ন দেখে, ভোগ বাসনার স্বপ্ন দেখে মনে আনন্দ পাওয়া যায় তখন বুঝতে হবে মনটা Lower Status এ রয়েছে, নীচু জিনিষে রয়েছে। লিখে রাখতে লাগলে, আবার যখন কোন ভালো স্বপ্ন দেখলে আনন্দ পাবে সারাদিন দিব্যভাবে ভরে থাকবে, তখন বুঝতে হবে মনটা Higher Ethical Level এ উঠেছে! তারপর কোন একটা অসৎ বা খারাপ স্বপ্ন দেখলে, তৎক্ষণাৎ জপ বা ঠাকুরের নাম স্মরণ হওয়া বা ডাক করে জেগে উঠে সে সব থেকে মন সরিয়ে নিয়ে আসার সক্ষমতা যদি হয়, তখন বুঝতে হবে মনটা high moralityর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—এসব করা স্বপ্নের দিক থেকে প্রয়োজনীয়তা আছে। তারপর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে স্বপ্নের Value যাতে বুঝতে পারি। অসৎ স্বপ্ন দেখে মনটা যাতে সরিয়ে আনতে পারা যায় তার জন্যও প্রার্থনা করতে হবে। এই রকম ভাবে dreamএর মধ্যে Self Study করতে করতে মনটাকে subconscious থেকে conscious তার থেকে Supper conscious বা God conscious এ তুলতে হবে। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের বলা আছে—'স্বপ্ন কি কয়?' অনেক ভক্তের চৈতন্যদেবকে দর্শন প্রসঙ্গে কথাটি বলেছেন ও ঠাকুরের চোখে জলও এসেছে। তা-ছাড়া অনেক দিব্য স্বপ্ন সত্যি হয়। তারপর অনেক সময়

দেখা যায় স্বপ্নের মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের নাম করে মন শুদ্ধ হলে অনেক সময় ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিপদের কথাও জানা যায়। তখন নাম প্রার্থনা করলে অসুখের ওপর দিয়ে কেটে যায় অনেক সময়।

শ্রীঠাকুর এইবার সাধুদের সঙ্গে নিয়ে কালীকীর্তন গাইলেন। কাল রাত্রে মাত্র ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করেছেন আবার অসুস্থ শরীর থেকে উঠে চার ঘণ্টা হোমে বসেছেন—বেশী Strain হয়েছে তাই মণিকর্ণিকাঠা প্রেসিডেন্ট মহারাজ এঁরা অনেক বলে শ্রীঠাকুরকে মন্দির মধ্যে পাঠালেন। একটু স্বস্তি করে চুপচাপ বসার জন্য।

৮ই জুন ১৯৬২

আজ বিশ্বকল্যাণ হোমে পূর্ণাহুতি হল। অসংখ্য গৃহীভক্ত ও তাদের বাড়ীর ভক্ত মায়েরা ছেলেমেয়ে কত যে এসেছেন—শ্রীঠাকুর সকলকে অগ্নিতিলক পরিয়ে দিলেন। পুরুষভক্ত ও সাধুদের সকলকে ভস্মতিলক পরিয়ে দিলেন। দৈ, আম, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে মাখানো চিড়ে প্রসাদ সকলকে দেওয়া হল। গৃহী ভক্তেরা শুধু নিয়ে শ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন—অফিস আছে।

শ্রীঠাকুরের কাছে এখন কেবল সব সাধুরা ও দু একটি গৃহীভক্ত রইলেন। সেন কাকা, সেন মা, তাঁদের নব বিবাহিত পুত্রবধূদের নিয়ে এসেছেন—শ্রীঠাকুরের কাছে জপ নেবার জন্য। এজন্য তাঁরা রয়েছেন, স্থানীয় দু একজন গৃহীভক্ত দুবরাজপুর প্রমুখ স্থানের দু একটি গৃহীভক্ত রয়েছেন। শ্রীঠাকুর সাধুদের সঙ্গে কথা বলছেন

শ্রীঠাকুর—সাধু সন্ন্যাসীদের সব সময় ধীর স্থির হতে হবে, 'শান্তম উপাসিত'। জানি তোমাদের ওপর দিয়ে নানান অশান্তি, নানান গোলমাল বয়ে যায়, তবুও শান্ত ধীর স্থির হতে হবে। তপস্যাতো তোমরা করছ-এই যে সাতদিন তপস্যার স্রোত বইল এইটি কায়েমী করে রাখার চেষ্টা করতে হবে—কাজের কাকে নামময়, জপময়, তপোনিষ্ঠ, স্বাধ্যায়শীল হতে হবে—বড় বড় বিষয়ে মনটা ধরা থাকলে ছোট খাট বস্তুতে বা বিষয়ে মন তখন আর যেতে চায় না—যদি জপে ধ্যানে শান্তি পাও—মনটা ঠাকুরের ধ্যানে কিছুটাও রস পায়, তাহলে আর কোন গোলমালে মনটা যাবে না। গীতায় ভগবান তো বলেছেন—

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।

আত্মানন্দ বা ভগবৎ আনন্দ পরম সুখকর, এর তুল্য সুখ বা আনন্দ আর নাই, এই অবস্থা লাভ হলে আর অন্য সুখ চাহিবা আদৌ থাকেনা—ওই আনন্দ বা সুখের চেয়ে অন্য সুখ বা আনন্দ তখন অতি অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। আর ওই আনন্দ লাভে মন তখন এমন ভরপুর থাকে যে কোন দুঃখ তখন তাকে বিচলিত করতে পারেনা।

কিন্তু এখনও সেই বয়সের, শান্তি তোমরা পাওনি, চেষ্টা করে যাচ্ছ ঠিকই কিন্তু চার পাশের ভোগ বিলাস আবিলতার স্রোত এত বইছে আর সেই স্রোত আশ্রমের সন্তীর ভেতরেও ঢুকবার চেষ্টা করছে—কাজেই করবে কি? কাজেই ঠাকুরকে জোর করে প্রার্থনা ক'রে যাও। প্রায় সব কুড়ি বছর পড়ে রয়েছ জপ ধ্যান নিয়ে কিন্তু ঠিক Sincere প্রার্থনা কি করতে পারছ? আচ্ছা বিমল,সুনীল, কেষ্টআর তোমরা সকলে যারা বুদ্ধিমান, rational তাদেরই জিজ্ঞেস করছি খুব Sincere বুক নিঙরানো প্রার্থনা কি তোমাদের আসে—যে প্রচেষ্টাটা তোমাদের, কর্ম্মের মধ্যে রয়েছে—শিক্ষা বা বিদ্যার্জ্জনের মধ্যে রয়েছে। সপ্তাহে একটা দিনও কি মনে মনে আকুল প্রার্থনা জাগে যে ঠাকুর তোমার সেই অপরূপ রূপের জ্যোতি একটু দেখাও, এই প্রার্থনা কি জাগে? হবে কি করে বলো তো? চারিদিকের বস্তুতান্ত্রিকতা এত বেড়ে গেছে, রাশিয়া আমেরিকাতে materialism এত বেড়ে গেছে, সেই স্রোত এখানেও এসে গেছে কাজেই জাগতিকতা, বস্তুতান্ত্রিকতা এত বেড়ে যাচ্ছে আর বাড়ার ফলে ভাবতান্ত্রিকতা Idealism সব চলে যেতে বসেছে বা চলে যাবে। কাজেই এখন ওই Pattern of life ঠিক করে নিয়ে মেকানিক্যাল life Lead করতে হবে। জপে ধ্যানে লেগে থাকতে হবে, সে জোর হয়তো ভালোও লাগবে না তবুও লেগে থাকতে হবে। ভজনে জোর রস পাবে না তবুও জোর করে যেতে হবে। কাজেই আমি গানে মধ্যে মধ্যে জানাই যে, আমাদের একটু করে দর্শন দিয়ে, কৃপা করে মনটাকে টেনে নিতে হবে। একটু কৃপা করতে হবে, আকুলতা দিতে হবে একটু প্রার্থনা রাখতে হবে।

Relativity-র Theory অনুসারে space-এ যত

mass বা matter এর weight বাড়ছে তত space এর curvature বেড়ে যাচ্ছে—ঠিক তেমনি ভাবে মনের মধ্যেও যত কর্ম্মস্রোতের টান বাড়ছে, যত materialism এর প্রভাব বাড়ছে, তত মনের curvatureও বেড়ে যাচ্ছে। এখন যদি বৈদিক যুগে রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে মনটা ভোগ বিলাসের চাপে, কর্ম্মের চাপে ক'বার হোঁচট খেত— আর এখন রাস্তায় চলতে গেলেই মনটা হোঁচট খাচ্ছে। ভোগ বিলাসের স্রোত কর্ম্মস্রোত মনের ওপর এসে যাচ্ছে কাজেই তোমাদের বলিই বা কি বলো। এই তো নূপেন ইঁটের পর ইঁট গেঁথে যাচ্ছে অথচ সে তুলনায় ভগবৎ দিকটা কতটা হচ্ছে? বীরেন (বীরানন্দের প্রতি) তোমার চিঠি লেখার পদ্ধতি সেটাও বলি—

এই কথায় সব খুব রঙ্গ করে চিঠির ভাব-ভাষা লেখাতে লাগলেন আর সকলে হাসতে লাগলেন।

শ্রীঠাকুর—অবশ্য তোমরা জগতের economic সুবিধা যতখানি করছ ততখানি ethical উন্নতি সাধন করে যাচ্ছ কে আর ততখানি করছে বলো কিন্তু তবুও সেই ভগবৎ নামে প্রীতি, আনন্দানুভূতি হচ্ছে কই—এখন জগতের যা পরিস্থিতি এখন দরকার হচ্ছে সব ভেঙ্গে চুড়ে আবার নতুন করে সহজ সরল সৃষ্টির, Hydrogen bomb, Atom bomb তো এসে পড়েছে এখন কবে পড়বে। নাও একটু সব কথামৃত পাঠকর।

শ্রীঠাকুরের আদেশ মত সকলে একে একে পাঠ করলেন। শ্রীঠাকুর এরপর সকলকে প্রসাদী সিঁদুর পরিয়ে দিলেন ও মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

আজ তাঁরা ছেলেরা বর্দ্ধমানে সত্যেনবাবুর বাড়ীতে কালী কীর্ত্তন করতে যাবেন, তার ব্যবস্থাও করলেন। যার কালীকীর্ত্তন, ভজন ইত্যাদি পারে তাদের প্রতি বললেন—

সুনীল, বিমল, অরুণ, তারা সব তোরা কালী কীর্ত্তন ভজন রোজ করবি। বিমল গলাটাকে নষ্ট করে ফেলছিস টেপ রেকর্ডে এবারে আগের মত সেই মিষ্টতা ওঠেনি গলার মাধুর্য্য নষ্ট হতে দিস না।

শ্রীশ্রীগোপাল সুন্দরজীকী মহিমা কীর্ত্তন

স্বামী দামোদর দাস

ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী
ভব সাগর পারকে নাথ তুমহী গিরিধারী
চরণমে রাখো অব নিবারো প্রভু বংশীধারী।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী॥

গুরু রূপ ধরি তুমহি আয়ো তাপত্রয়হারী,
দীনজনে করহ মোচন সঙ্কট অতি ভারী।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী॥

কাম-ক্রোধ আদি সব আয়ো দাবানল ভারী,
হরো নিশিদিন রাখহু দাস জানি তাপ হারী।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী॥

নৃসিংহ রূপ তুম আয়ো হিরণ্যকশিপু মারো,
প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদ আদি সবকে তুম নিবারো।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী॥

রামরূপ তুম আয়ো রাবণাদি সবকো মারো,
হনুমান রূপ ধরি সীতা রাম কাজ সংবারো।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী॥

তুমহী কৃষ্ণরূপ আয়ো কংস পুতনাদি মারো,
ইন্দ্র যব ওয়ারো গিরিধারী জীব তাপ হারো।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী॥

দেবকী-বসুদেব আদি রক্ষা কিয়ো তুম স্বামী,
তুম সমান দয়ালু ঔর নহি অন্তর্যামী।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন-পুকার হমারী॥

দ্রৌপদী-সুদামা-মীরা ভক্ত জানি আয়ো ধাই,
রক্ষা করি লাজ রাখো পরিজন সমুদাই।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী॥

তুম সমান দয়াল জনমে দীন হিতকারী,
বেদ পুরাণ মহিমা বখান করে অতি ভারী।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী॥

জো জন প্রেম ভক্তি সে গোপাল মহিমা গাবে,
সো জানে গোপাল পরমপদ নিশ্চয় পাবে।
ও জয় গোপাল সুন্দর সুন পুকার হমারী॥

মনের বাঁকে

শ্রীশরণাপুরী

ভাষা আমার নদীর জলে
যে নদী উপল বুকে বাধাহত
স্বপন আমার রাত্তির বুকে
সে রাত্তি গহন দুখে আখিনত
হাসি আমার দুখীর বুকে
যে দুখী দমকা ঝড়ে ঝর ঝর
ব্যথা আমার শ্রাবণ ক্ষণে
সে শ্রাবণ নয়ন জলে ভর ভর

চলা আমার সেই পথেতে
যে পথেতে চলার বাধা শত শত
আশা আমার সেই ফাগুনে
যে ফাগুন ঝড়া পাতে সাজে যত
গান যে আমার সেই গগনে
যে গগনে ক্ষণে ক্ষণে মেঘেই ঢাকে
আনন্দ মোর সেই প্রহরে
যে প্রহর জড়িয়ে আছে মনের বাঁকে।

জলে ঝড়ে

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

কেন পথে পথে তোর দিন যায় রাত যায় ব'লে
স্রোতে ভেসে যায় সব স্বপ্ন সফলতা গলে গলে
কার জন্য বার্থতা'র ম্লান ক্লান্তি নীরব দুপুর
এত সূক্ষ্ম মনে হয় কি বেদনা বুকে বাঁধে সুর
কে এলো কে আসবো বলে এলোনা বাতাসে কেউ ডাকে
তোর নাম ধরে কেউ অবিরল, রেখেছিস তাকে
কোনদিন চুপি চুপি খুব দুঃখী ব্যাকুল বিকেলে
সে কি কোনদিন এসে চলে গিয়েছিল তোকে ফেলে ?
কার জন্যে চোখে তোর কালি তোর এ জীবনময়
ব্যর্থ প্রতীক্ষার ব্রত পথে পথে ছড়োলো সময়
মুড়োলো রঙিন ন'টে, চিতা বাহিনীর অন্ধকার,
তবু একা জেগে থাকবি খুলে রাখবি দ্বারসাহসী যার ?
চেয়ে থাকবি সারারাত বিশাল প্রান্তরে তৃষ্ণা নিয়ে
ব্যাদনা ব্যাকুলহীন গল্প বুকে বানিয়ে বানিয়ে।
ঘরকে বাহির করে স্বরগরলের ধ্রুবপদে

কে তোকে শোনাল বাঁশী সংসারের বিশালাক্ষী হ্রদে
কি কথা কি সুপ্তস্মৃতি কি যেন অস্ফুট প্রতিধ্বনি
জন্ম জন্মান্তর ভেঙে ভেসে আসে নিরুপম ঐশ্বর্য্যের খনি
যেন ঝলসে নিভে যায় ঘন অন্ধকারে তোর ঘর
নিরেট নিশ্ছিদ্র করে পৃথিবীর ব্যাপ্ত চরাচর
এমন কাহিনীহীন গল্প তোর বুকের গহনে
কি লাভ সাজিয়ে বৃথা চিরকাল কুহুকে চন্দনে।
তুই কি ভাবিস কেউ তোর জন্যে মূল্যবান বেলা
নষ্ট ক'রে কষ্ট ক'রে এসে খেলবে তুচ্ছ ছেলেখেলা ?
ব্যস্ত ও বিরক্ত কেউ তোর দুঃখে তোর যন্ত্রণাতে
এসে দাঁড়াবেনা হেসে জীবনের আত্মঘাতী রাতে
তুই কি ভাবিস কেউ মুছে দেবে দুটী হাতে জীবনের ক্ষত
অক্ষিভূত ভুলে তোর জটিল সন্ত্রাসে ত্রস্ত জননীর মত ?

দিন যায় রাত্রি যায়, সংসারের নিরেট তামাশা,
একটি মমতার দীপ জ্বলে তার জলে ঝড়ে তীব্র ভালোবাসা।

অলৌকিক রহস্যপূজা—শ্রীশ্রীমা সারদার দিব্যাধারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শীপূজা

শ্রীসমরেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

৮। মহাদেবীর মন্ত্রময়ী ষোড়শীরূপে মা সারদার দিব্য দেহাধারে আবির্ভাব ও তাঁর সেই আধারে রহস্যপূজার তাত্ত্বিক গূঢ় তাৎপর্য্য।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য গোপীনাথ কবিরাজ বলেন: জগন্মাতা সর্ষবার রূপেই পূজিতা। সর্ষবা রূপটি জীব ও মায়িক জগতের মাতৃস্বরূপা, কিন্তু কুমারী রূপটী শিব ও মহামায়া জগতের মাতৃস্বরূপা।[১৮] মূর্ত্তির সত্যস্বরূপটী সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন:— The manifestation of the universe due to the free will of the Absolute is a process of Abhasa. The peculiar metaphysical position of the tantra consists of the theory of Abhas which is consistent with this position. It rejects the vivartabad of Neo-vedanta, because, this world is not originally a false appearance due to Error. It is real in the same way as the image is real, but it has no existence apart from the medium in which it is manifested. Its existence is only the existence of the medium" বিশ্ব সৃষ্টি পরম দিব্যের স্বাতন্ত্র্যঅভিলাষী প্রসূত ঐ সৃষ্টি ক্রিয়াকে "আভাস" প্রকরণ বলে। তন্ত্রের এই বিশেষ সৃষ্টি তত্ত্বক্রিয়া প্রকরণ "আভাস" মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। নব্যবৈদান্তিক বিবর্ত্তনবাদকে আভাস-বাদ অগ্রাহ্য করে। বিশ্ব মূলতঃ ভ্রান্তি অনুস্যূত অলীক সত্তা নয়। বিশ্বও সত্তা এবং বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট মূর্ত্তিও সত্তা। বিশ্ব বা মূর্ত্তি আধারে প্রকাশ। আধার না থাকলে বিশ্বও নাই, মূর্ত্তিও নাই। নামরূপাধারেই বিশ্বের প্রকাশ নচেৎ তা অবাক্ ও অপ্রকাশ। ঠাকুর এক কথায় মূর্তি রহস্য সমাধান করলেন, বল্লেন "ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। ঠাকুরের মা সারদার দিব্যমূর্ত্তিতে চিদানন্দময় একাত্মানুভূতির ও তাদাত্ম্যময়তার পূর্ণত্বকে ষোড়শী বা স্বয়ং সাধকাত্মা বলা হয়। এইজন্যেই ঠাকুর মা সারদা আধারে রহস্য পূজা ক'রে "সাহং" সিদ্ধ হলেন। ঠাকুর নহবত ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে ডাকতেন "ওগো ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ি।"

মা সারদা সর্ষবা: জীব ও মায়িক জগতের মাতৃস্বরূপা গান্ধর্ব তন্ত্রমতে রহস্যপূজা কালে সাধক স্বীয় শক্তিকে মানবী ভাববে না। পরাশক্তিরূপিনী মহাদেবী সাধকের স্বীয় শক্তির মানবী আধারে দশমহাবিদ্যার যে কোন মন্ত্রময়ী রূপে অবতীর্ণা। এই দিব্যবুদ্ধিতে শক্তিরূপিনী স্বীয় শক্তিকে গ্রহণ ক'রে মন্ত্রযোগ অনুষ্ঠান ক'রলে, সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়, নচেৎ হয় না। সাধকের স্বীয় শক্তি স্বরূপত মহাদেবীর কুণ্ডলিনী বা চৈতন্য যুক্ত শক্তির অংশ। সাধক স্বীয় শক্তির সুপ্ত অবস্থাকে সাধন ক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণ জাগ্রতা ক'রে, তার সঙ্গে স্বীয় জাগ্রতা শক্তিকে যুক্ত ক'রবে। স্বীয় শক্তি ভোগ্যাশক্তি নয় দিব্যদেবীর কৌলাচারীর। স্বীয় শক্তি

(১৮) পত্রাবলী—১।১৭৯; (১৯) Aspects of Indian thought. 220

মহাদেবীর মহাশক্তির অন্যতম স্বরূপ। শক্তি সঙ্গম তন্ত্র বলে—

মহাকুণ্ডলিনীত্বংযোগার্থং মহেশ্বরি।
শক্তিপ্রোক্তা মহেশানি ন ভোগার্থংমহেশ্বরি॥[১৯]

ঠাকুর যোগক্রিয়াবলে নিজের চৈতন্যশক্তি শিবচৈতন্যে, ও মা সারদার চৈতন্যশক্তি শিব্ চৈতন্যে যুগপৎ সাময়ন্তে মিলিত করে হলেন একই ক্ষণে দুজনার সমাধিস্থ। তাঁদের যুগলদ্ধ আত্মিক অতিমানস চৈতন্যলোকে চিদেকরস সত্তার হ'ল মিলন। সাধক ও সাধ্যের দ্বিত্ব সত্তার লয়ান্তে চলে তাঁদের অতিমানস চৈতন্যলোকে একটি অখণ্ড আনন্দ বা প্রেমামৃত বা শক্তি প্রবাহ।

২। ঠাকুর রামকৃষ্ণের মা সারদাকে তাঁর যোগ্যা সাধন সঙ্গিনী প্রস্তুতি করে তাঁর সংস্কার বা দীক্ষা ক্রিয়া।

মা সারদা বিবাহের পর কামারপুকুরে বাসকালে অতি যৌবন অবস্থায় পশ্চিম ভারতের কোন সন্ন্যাসীর (পূর্বাশ্রমে স্বামী) কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেন। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে তন্ত্র ও ব্রহ্মসাধনায় সিদ্ধির দ্বারে। পূর্ণসিদ্ধি লাভ করে, ঠাকুর প্রায় দুই বৎসর কামারপুকুরে বাসকালে, মাকে সাংসারিক বিষয়ে শিক্ষা দান করা ছাড়া, ধ্যান জপ, ব্রহ্মতত্ত্ব, সমাধিতত্ত্ব বিষয়ে নানা উপদেশ দিতেন ও নানা-মন্ত্র মাকে শিখিয়ে দিতেন। তারপর মা ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে এসে নহবত ঘরে বাস করতে লাগলেন। ঠাকুর তখন সিদ্ধের সিদ্ধ দিব্যবীর কৌলজ অবধূত পরম-হংস, কিন্তু গৃহমেধী। মা ঠাকুরের সেবার ভার হাতে নিয়েও, জপ, ধ্যান, ইষ্টপূজা নিত্য অনুষ্ঠান করতেন। মায়ের সাধনা চলছে, কিন্তু দিব্যানুভূতি ত' হয়না। যোগেন মাকে মা সারদা একদিন বলেন :—

"ঠাকুরকে বল, আমার যেন ভাবটাব কিছু হয়।" যোগেন মা ঠাকুরকে মায়ের প্রার্থনা শোনাতেই ঠাকুর গম্ভীর হয়ে উদাসদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। যোগেন মা তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে প্রণাম করে নহবত ঘরে এসে দেখলেন যে মা সারদা ধ্যানযোগে ভাবযোগে, সমাধিস্থা, কখনও হাসছেন, আবার কাঁদছেন, আবার কখনও বাহ্যজ্ঞান শূন্য! ঐ ঘটনার পরে কোন একসময় দক্ষিণেশ্বরে হঠাৎ মা ঠাকুরের কাছে একা এলে, ঠাকুর মাকে জিব বার ক'রতে বলেন ও নিজ নখাগ্র দিয়ে মার জিবে মন্ত্র লিখেছেন।[২০] ঐ প্রথম দীক্ষা ক্রিয়া দ্বারা ঠাকুর স্বীয় শক্তি মা সারদার মধ্যে সঞ্চালন করলেন, যার ফলে মা নহবত ঘরে হলেন সমাধিস্থা নিমেষের মধ্যে। ঐ ক্রিয়াকে "বেধময়ী" দীক্ষা বলে। দ্বিতীয় দীক্ষা ক্রিয়াটিকে বলে "স্পর্শিনী বাচীকি" প্রকরণে দীক্ষা। প্রতিটী দীক্ষা ক্রিয়া দ্বারা ঠাকুর ক্রমশ মার অন্তরে শক্তি সঞ্চালন করে, তাঁকে ঠাকুরের সমভাবাপন্ন ক'রে আনলেন ও মা ঠাকুরের যোগ্যসাধন সঙ্গিনী হয়ে উঠলেন।

বিশেষ লক্ষণীয় এই যে সদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ দীক্ষাদান কালে তিথি, নক্ষত্র, ও মায়ের রাশিগণ বিচার না ক'রে, শাস্ত্রানুসারে বাহ্যিক কোন আচার অনুষ্ঠান না ক'রে মাকে দীক্ষা সংস্কার ক্রিয়া দ্বারা আধার শুদ্ধি করেন। প্রাতিভ-জ্ঞানী ও যোগী সাং সিদ্ধিক সদ্‌গুরু বলেই, ঠাকুর শুধু কয়েকটি শাস্ত্র সম্মত গূঢ় ক্রিয়া শৈলীর কলাকৌশলে মাকে যোগ্য সাধন সঙ্গিনী করে তোলেন স্বীয় শক্তি মার আধারে সঞ্চালিত করে।

ঠাকুর মার জিবে যে মন্ত্র লিখে দিলেন, শাস্ত্রমতে মন্ত্রটী কি হ'তে পারে, তা বিবেচনা সাপেক্ষ। কোন কিছু বিচার না ক'রে, কোন আচার অনুষ্ঠান পালন না ক'রে ঠাকুরের মত সদ্‌গুরু মাকে এমন একটি সিদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষা দেন, যে মা যেন সেই মন্ত্র শুধু জপ ধ্যানসহ সাধনে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। কুলার্ণব তন্ত্র মতে, মন্ত্রটি অখণ্ড ব্রহ্ম মন্ত্র :—

"ওঁ সর্বদেবতাময় কুলকুণ্ডলিনীযুত বিন্দ্বাত্মক পর ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ॥[২১]

শক্তিমন্ত্রের সাধক বা সাধিকা, সগুণ ব্রহ্ম মন্ত্র দীক্ষায় অধি-কারী বিবেচনা ক'রলে সদ্‌গুরু সেই মন্ত্রেই দীক্ষা দেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার পর সদ্‌গুরু শিষ্যকে সগুণ ব্রহ্মমন্ত্র দেন। ঠাকুর সকলের আগোচরে, এমনকি মায়ের অগোচরে, নানা ক্রিয়া শৈলীর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ও কালে

(১৯) শক্তি সঙ্গমতন্ত্র ৩২ পটল, ২৭ শ্লোক। ২০। শ্রীমা সারদাদেবি ১৩৩-৩৮। ২১। মহানির্বাণতন্ত্র (১৯২০) ৪৯ পাতা।

ক্রম পর্য্যায়ে "যৌনী" চ'ক্ষুষী স্পর্শিনী, বাচিকী মান্ত্রিকী ও সর্বশেষে "বেধময়ী" দীক্ষাদান করে, যাতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে পূর্ণজাগ্রতা ও প্রতিষ্ঠিতা করেন, ও যাকে সমভাবাপন্ন সাধন যোগ্য শক্তিরূপে পরিবর্ত্তিত করেন। ঐসব দীক্ষা ক্রিয়ার শাস্ত্রার্থ জানতে হলে মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও আচার দ্রষ্টব্য।[২২]

সদ্‌গুরুর পর্য্যায় ক্রমে দীক্ষা ক্রিয়া চলতেই থাকে, যতক্ষণ তিনি শিষ্যের আধারে স্বীয়শক্তি সঞ্চালন করে তার আধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি পূর্ণজাগ্রতা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা করেন ও সেই শক্তি সহায়ে শিষ্য স্রোতাপন্ন না হয়।"[২৩]

যন্ত্রযোগী উডরফ বলেন :—যথার্থ উচ্চতম মার্গের দীক্ষা দান কালে সদ্‌গুরু শুধু মন্ত্রদান ক'রে ক্ষান্ত হ'ন না। তিনি স্বীয় সাধনলব্ধ শক্তিকে শিষ্যের আধারে সঞ্চারিত সঞ্চালিত করেন। তখন শিষ্য গুরুকৃপাপ্রাপ্ত গুরুশক্তির সক্রিয় গতি নিজ অন্তরে উপলব্ধি ক'রতে পারে, ও সেই গুরু শক্তি সহায়ে নিজের আধুনিক সংস্কার সাধন করতে পারে।[২৪] মহামহোপাধ্যায় আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন :—"The greatest power, however, is the supreme efficiency of the will, whereby the yogin can arrange the bhutas in any manner he wills. He can make any object serve any purpose and is not tred down by the so-called natural properties"[২৫] চরমতম সক্রিয় শক্তি হ'চ্ছে ইচ্ছাশক্তি যাহার সহায়ে যোগী যথেচ্ছ ইচ্ছামত বিন্যস্ত ক'রতে পারে। যে কোন জড়পদার্থ বা চেতন পদার্থকে যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে ও তাহার প্রকৃতধর্ম্ম যোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্যকরী হ'তে না। যোগী বিষকে অমৃত ও অমৃতকে বিষে রূপান্তরিত করিতে পারে।" শ্রীঅনির্ব্বাণ বলেন :—

The relationship between master and disciple is established by infallible law, with a view to esoteric transmission of cosmic law and its operation.

For the Master transmits what has become his own substance. It is through this substance that the disciple will taste what he is able to assimilate, of the law.[২৬]

"শিবেচ্ছয়া" সদ্‌গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সংযোগ ঘটে গুরু কর্ত্তৃক স্বীয় কুণ্ডলিনী শক্তি শিষ্যের আধারে রহস্য প্রকরণে সঞ্চালন মানসে। কারণ গুরু তাঁর স্বীয় শক্তিই শিষ্যের অন্তরে সঞ্চালন করেন। গুরু শক্তি সহায়ে শিষ্য অধিকার সাপেক্ষে দিব্য রস আস্বাদন ক'রতে সক্ষম হন।

শাস্ত্রবাক্য ও মহাজনদের সাধনলব্ধ জ্ঞান অনুধাবন ক'রলে বোঝা সম্ভব হ'বে যে ঠাকুর ক্রমান্বয়ে স্বীয় শক্তি সঞ্চালন করে মা সারদার আধারে তাঁর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা ও প্রতিষ্ঠিতা করে, তাঁহাকে স্রোতাপন্ন অবস্থায় উন্নীত করেন। সেইজন্যেই মা সারদাকে ব্রহ্মাবস্থা লাভের জন্য বিশেষ কোন চতুর্বর্গ সাধন প্রয়াস অনুসরণ ক'রতে হয়নি।[২৭] (ক্রমশঃ)

২২। তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও আচার, ২১৩, ২১৫, ৩০৩। ২৩। তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও আচার ৩০২। ২৪। শক্তি ও শাক্ত ১০—ইংরাজি হইতে বাংলার অনুবাদ। ২৫। Aspects of Indian thought ১২৫। ২৬। Live within আত্মজীবন—L. Reymond 141, 143. ২৭। তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও আচার—৩০৩—"স্রোতাপন্ন" অবস্থার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। লয়যোগ অনুসারে সমাধি লাভ করবার ক্ষমতাকে "স্রোতাপন্ন" অবস্থা বলে।

অভেদানন্দ

স্বামী অরুণানন্দ

যুগ-ধর্মাবের যুগকর্তা ছেলে যে স্বামী অভেদানন্দ
লীলা-সাথী তুমি ও ত্রি নরদেব সবার নয়নানন্দ।
তোমার সাধনা প্রতিভার দ্যুতি অক্ষয় স্বরূপ ধরি
মহাকাল বুকে রহিল যে আঁকা অমীয় আলোর গান॥
সে আলোয় আর নহে আলোকিত শুধু এ মাটির প্রাণ
গ্রহান্তরের লোকে লোকে আজ এনেছে অরূপ বান॥
চির ভাস্বর তপের বহ্নি জ্বলেছো অহর্নিশ।
কালী তপস্বীর তপশক্তিতে মৃত জনে পেল প্রাণ॥
বিলায় করেছ অবাধে সে তুমি জ্ঞানের সকল পথে
অনুভূতি বিনা কোনের সত্যকে পার নাই কেনে নিতে॥
এই ভবিতের ঘাটী অন্তরে কত আছে যেন গাথা—
ছুটিয়াছ তাই দিকে দিকে তুমি জানিবারে সেই কথা॥
হিমালয় পারে তিব্বতে গেছ আলাতে প্রদীপখানি।
দুর্গম পথ জয় করিয়াছ অমিয় বাণী॥
বিবেকের ডাকে অভেদ আসিল সাগর পারের দেশে।
ফুল সৌরভ ভরিল সেথায়—হৃদয়ে হৃদয়ে মিশে॥
পশ্চিম দিল প্রাণের অর্ঘ্য বরণ থালাখানি॥
বিবেক অভেদ শোনাল তাদের নববেদান্ত বাণী॥
ঝলকি ঝলকি উঠিল সেথায় ত্যাগের অগ্নি শিখা।
সে দীপ্ত পরশে লভিল জীবনে পূত স্বাক্ষর আঁকা॥
প্রেমারুণ আভা নয়নে তোমার—ডাকে সবে আয় আয়।
শ্রীরামকৃষ্ণ নামের তুফানে আখিলতা ভেসে যায়॥
'কালীর প্রসাদী ফুল' তুমি জানি পায় সে অচিন ঘাউল।
অথবা আমার ধরা দিল এসে এ রূপের নাই তুল॥
রামকৃষ্ণের কালী তপস্বী—সত্যব্রতের গুরু।
পুন এবার আচার্যারূপে নবলীলা হয় সুরু॥
কিংবদন্তী নহে এতো জানি নহে কোন রূপকথা।
বয়সের পর বয়স কেটেছে সে এক পুণ্য গাথা॥
দক্ষিণাপুরের ভবতারিণী ত্রিনয়নী রূপ ধরে।
সত্যানন্দের কোল আলো করে এলো সে দুলালী মেয়ে।
সার্থক তুমি নয়ন তারার হৃদয় দুলাল ছেলে—
কালীশ্বরীর নয়নানন্দে ছেলে বলে কোলে নিলে॥
চির ভাস্বর চির অক্ষয় চির প্রদীপ্ত নাম।
অভেদ সত্যানন্দ আলোয় ধন্য হল এ ধাম॥

বীরভূমের পুরাকীর্তি

বীরভূম জেলার অন্তর্গত সারেঙা গ্রাম নিবাসী শিক্ষক শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইতেছেন যে, তাঁহাদের সারেঙা গ্রামে ধারকা নদীর তীরে অবস্থিত ঘাংবাসিনী মন্দির সংলগ্ন জমি খনন করিয়া পাথরের উপর খোদিত চিত্র ও লাল পাথরের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঘাংবাসিনী মন্দির আনুমানিক ২০০/২৫০ বৎসরের পুরাতন। মন্দিরাভ্যন্তরে দুর্গা-কল্পিত শিলামূর্তি এখনও পূজিত হন। মন্দিরটি সম্ভবতঃ মল্লরাজাদের আমলে তৈরারী বলিয়া মনে হয়। মন্দির সংলগ্ন জমি খনন করিলে আরও কিছু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সারেঙা যাইতে হইলে সিউড়ী-রামপুরহাট লাইনে বাসে গিয়া ডেউচা বাসষ্টপে নামিতে হইবে। ডেউচা হইতে সারেঙা'র দূরত্ব ৩ মাইল। ডেউচাতে রিক্সা পাওয়া যায়। সংবাদদাতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানা : গ্রাম+পোঃ সারেঙা, জিলা বীরভূম।

সংবাদ প্রেরক:
ডক্টর স্বামী নীলানন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের চিঠি

[লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পর্কে লেখকের সপ্রেম উক্তি]

Surja Apt. 53 Warden Rd.
Bombay 400026.
12. 5. 77

বীরানন্দ কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠির উত্তর দেব দেব ক'রে দেওয়া হয়নি, নানা কারণেতায়। আমার শরীর সেরেছে, তবে এখনো দুর্বল। সুখবর এই যে, ইন্দিরা সাধুত্রিক সম্বন্ধে একটু ভালো বোধ করছে, তাই মনে করছি আরো কিছুদিন—হয়ত দশ বারো দিন—থাকব এখানে। রোজ সন্ধ্যায় নাম গান হয়—আমিও কিছু কিঞ্চিৎ বলি—সৎকথা—হরিকথা, গুরুবাণী। সেদিন পান্ডিচেরীর ওখানে এক ঘণ্টা বলেছি শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী, যোগ ও আমার দীক্ষার কথা। মনে হয় সত্যিই যে ঠাকুর কৃপা ক'রেছেন বলে এ অসম্ভব সম্ভব হ'ত না—আমি থাকতাম শুধু গানের আদর্শ নিয়ে, ওজন হ'ত গৌণ। কই আর্ত, শোকতপ্ত, জিজ্ঞাসু যে আসে···সত্যিই ঠাকুরকে প্রণাম করি—যা পারি কিছু তো অন্তত বলি তাঁর অহৈতুকী করুণার কথা। দেশের —শুধু (স্বদেশের কেন—সর্বত্রই) অর্থ ও রাজনৈতিক হাল ভাঙ্গা। আনন্দের কথা এই যে এ-যুগে এখনো জয়প্রকাশ নারায়ণের মতন মহাপ্রাণ মানুষ জন্মায়। একটি মানুষের চরিত্রমহিমার গুণে মানুষ অন্তত না পাক ভরসা পেয়েছে কিছুটা অন্তত! শ্রীঅরবিন্দ অকারণ লেখেননি সাবিত্রীতে : "One mighty deed can change the course of things."

আমি এখন 'স্মৃতি চোরাবে দুকূল ছেয়ে'র পাণ্ডুলিপির পুনর্মার্জন করছি—১৯৪৪ সালের স্মৃতিচারণ, তখন অনেকেই ছিলেন যাঁরা চাক্ষুষ করেছেন ঠাকুরের কৃপায় অঘটন। আজও ঘটছে অঘটন। হয়ত পরে সে সব লিখব। বার্ধক্যে দেহের দুঃখ সইতে হচ্ছে বৈ কি, কিন্তু ঠাকুর মনকে এখনো তাজা রেখেছেন। তাঁকে প্রণাম। তোমাদের—সতীর্থদের স্নেহাশিস। এখানেই লিখো। পত্রপাঠ লিখলে পাব। ইতি

তোমাদের স্নেহাধীন দাদা

জয়প্রকাশ নারায়ণ স্মরণে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমায় নমি আমরা জয়প্রকাশ নারায়ণ,
মহামতি, ছুটলে আপন আলোয় উজলি'
দিলে দিশা—কোথায় সত্য স্বরাজের আসন,
ডাকে প্রেমের ঐক্যতানের অকূল মুরলী।

To Sri Jayprakash Narayan

We bow to you in reverence
For being what you are,
For leading us to the Land of Truth
And the Goal of Love's Pole star.

In grateful affection
Dilip Kumar Roy.

Bombay
19. 5. 77

শ্রীসত্যানন্দ ভাগবত

[সরোজিনীর দর্শন]

শ্রীগুরু

দীন বেশের ভিতরে কত অমূল্য মুক্তা যে লুকিয়ে থাকে, কে তার খোঁজ রাখে! সাধারণ গৃহী জীবনের আড়াল টেনে কত সত্যদ্রষ্টা যে বিচরণ ক'রে যায় পৃথিবীর বুকে, কে তার সন্ধান করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দের নিগূঢ় কৃপায় যাঁদের দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে সত্যের অপিহিত মুখ অপাবৃত হয়েছে, তাঁদের চিনে ফেলতে দেরী হয়নি স্বর্গীয়া সরোজিনী দেবী। শ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তান হীরেনের গর্ভধারিণী জননী সরোজিনী মাঝে মাঝে চলে আসতেন আশ্রমে। সরলপ্রাণা সরোজিনী ছিলেন আনন্দময়ী। শ্রীঠাকুর ছিলেন আনন্দস্বরূপের মূর্ত রূপ। সরোজিনীকে নিয়ে তাই জমে উঠতো রঙ্গ-হাসির আসর। সন্ন্যাসিনী মায়েরাও যোগ দিতেন সেই আসরে।

সরোজিনী ছিলেন কৃষ্ণ ভক্ত। বৃন্দাবন বিহারী মুরলী মনোহরের মাধুর্যলীলার ধ্যান বিলাসে সদামগ্ন থাকাই ছিল তাঁর একান্ত সাধনা। প্রভুপাদ শ্রীযতীন্দ্র গোস্বামীর দেওয়া মন্ত্রবীজ তাঁর হৃদয়ের গভীরে শিকড় গেড়ে কৃষ্ণলীলার পত্রপল্লবে বেড়ে উঠেছিল। অন্তর্যামী প্রভু সত্যানন্দ তাঁকে নিয়ে মিষ্টি রঙ্গ রহস্য করার ছলে জিজ্ঞাসা করতেন—"হ্যাঁ মা! আপনার কৃষ্ণ এখন কি করছেন?" তিনি সলজ্জ ভঙ্গিতে মৃদু হেসে হয়তো উত্তর দিতেন "প্রভু এখন গোঠে রয়েছেন বাবা, বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ঘামছেন। গাছতলায় সখাদের নিয়ে বসেছেন একটু জিরিয়ে নিতে।" ঠাকুরও মৃদু হেসে উপভোগ করতেন। হয়তো ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, আপনার কৃষ্ণের রঙ কেন কালো? দেখুন তো, আমাদের গদাধর গোপালের রঙটী কেমন কাঁচা সোনার মত টুকটুকে সুন্দর। একাধারে রাম আর কৃষ্ণ আমাদের গদাধরকেই সব।" সরোজিনী বলতেন—"হ্যাঁ বাবা, সবই এক সবই এক।" কিন্তু ঠাকুরকে না বললেও মনে মনে বলতেন "সব এক তো ঠিকই, তবু আমার কাছে ঐ কালোই ভালো। 'মেয়ে তো এক গিন্নির নাগর দুসরা না কোই'। আমার কৃষ্ণই সব।" আর এই মনের কথা বলে ফেলতেন মায়েদের সঙ্গে পাল্টা রঙ্গ করার সময়। একদিন শ্রীঅর্চনা মা হাসতে হাসতে বললেন "দিদিমণি, আপনার কৃষ্ণ কালো, ও আমাদের পছন্দ হয় না। আমাদের কৃষ্ণ দেখুন কেমন ফরসা, কেমন দুধে আলতায় কাঁচা সোনা মাখা রঙ। আমাদের সাদা কৃষ্ণই ভাল।" দিদিমণির কণ্ঠে মিষ্টি প্রতিবাদের সুর—"ও গো মেয়ে, ও সব বলতে নেই। কৃষ্ণ তো ভগবান স্বয়ং। ভাগবতে বলেছে কৃষ্ণই ব্রহ্মের সবার উপর, তিনিই সব।" এই নিয়ে হাসাহাসি চলতে থাকতো বহুক্ষণ।...

'ওরে তুমি সব কি করিল গৌরব, দয়া না দিলে পারিস কি ধরিতে? ধরা দেওয়া যে ওঁর অহৈতুকী কৃপা। নিষ্ঠায় দৃঢ় অথচ সরল চিত্ত যে ভক্ত, সেই তো কৃপার অধিকারী। একদিন শ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপায় ধন্যাতিধন্য হয়ে সরোজিনী চলে এলেন শ্রীঅর্চনা মায়ের কাছে। চুপিচুপি বললেন—"শোনো মেয়ে! তোমরা সেদিন বলছিলে না, তোমাদের কৃষ্ণ সাদা? আমি সেদিন কি দেখেছি জানো? ঠাকুরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখি—ঐ দুধ বর্ণ একেবারে নীলমণির মত নীল হয়ে গেল। আর সে একটু আধটু ক্ষণ নয়, অনেকক্ষণ ধরে সেই নীল বর্ণ সত্যানন্দ-কৃষ্ণকে আমি দেখেছিলাম। ওঁর রঙ্গে ওপরটা সাদা, ভেতরে সেই নীল। কাজেই আর তোমরা আমাকে যতই বল, আমি সব বুঝে নিয়েছি। আমার কৃষ্ণই এই রূপ ধরে তোমাদের কাছে বলে

আছেন।"

এই তো রহস্য তাঁর অদ্ভুত ইষ্টনিষ্ঠার। এই আশ্রমের দীক্ষিতা না হয়েও তিনি গুরু কৃপায় ইষ্টকে উপলব্ধি করেছিলেন আশ্রম বিগ্রহ শ্রীসত্যানন্দের মাঝে। আর তাঁর তাগী সন্তানকে ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা ও শরণাগতি নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন ভক্তি-যোগে তাদের সুদীর্ঘ জীবন।

দুঃখের সম্রাট

সুরেন্দ্র মল্লিক

নীরব মেঘের মতো দুচোখে গোপন থাকে জল
কখনো সঞ্চিত হলে লক্ষ হয় ভিজে গেছে মাঠ
আজ মন বহে যায় খরস্রোত বেদনা তরল
কাঁটার কিরীটে তৃপ্ত চেয়ে আছে দুঃখের সম্রাট।

আজ তার অভিষেক নিয়ে আমি বন্দনার ফুল
সকল তীর্থের শোক, দীর্ঘশ্বাসে করেছি ব্যজন
বক্ষের যন্ত্রণা তার রাজদণ্ড, নিস্তব্ধ ব্যাকুল
স'গরণ মেঘ রক্ষী, রক্তাক্ত আঘাত আভরণ।

নীলচন্দ্রাতপ তলে যে রাজন কি অপূর্ব রূপ
কি সমৃদ্ধ মহিমায় করুণায় ক্ষমায় লিখিত
বিষণ্ণ মধুর তুমি, পদপ্রান্তে ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চুপ
ঈশ্বর কি এই হিম শান্ত ভালোবাসায় বিধৃত?

পৃথিবীর বুকে আজ কান পেতে শুনি মৌন ধীর
তোমার পরম মন্ত্র, জননীর গোপন ব্যথায়
যেমন হারানো ছেলে অগোচরে লালিত গভীর
উৎসব আনন্দ ধ্বনি বার্থ হয় অশ্রুর কোটায়।

শেষ খেয়া তোমার চরণতরী

নিবারণ চক্রবর্ত্তী

দিন কাটে মোর কোলাহলে পথে পথে ঘুরি
দুর্বিসহ রাতের প্রহর কি যে করি হরি।
না দিয়েছ জীবন ভরে
প্রাণ পাত্র পূর্ণ ক'রে
এখন সব শূন্য পড়ে পাইনা কিছু ধরি।

না বুঝায় তার বোঝা বয়ে ছিলাম মোহ প্রান্ত
হিসাব খাতার পাতা লেখায় আজকে হাত ক্লান্ত।
চারদিকে দুঃখ কালো
জ্বালাও প্রভু আশার আলো
পার হতে চাও শেষ খেয়া তোমার চরণ তরী।

জয় বদ্রীবিশাল

আরাধনাপুরী

কেদার ধাম দর্শন করে নেমে আসছি। পথে রাম-বাড়ার চটী। রামবাড়া চটীতে আমরা একটু নামলাম—কিছু খাবারের জন্য। আমরা বিস্কুট খেয়ে জল খেলাম আর মন্টু কিছু পকৌড়ি ও জিলিপি খেল। আবার আমরা রওনা হলাম। পথে অনেক চটী পড়ল। বহু রকম নাম মনে রাখা যায় না। সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা গৌরীকুণ্ডে এসে পৌছলাম। এসে দেখি যে ঘরটী আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম, সে ঘরটী খালি পড়ে আছে। আমরা আমাদের জামা কাপড় রেখে গেলাম গৌরী কুণ্ড দর্শন করতে। ইতিমধ্যে যোগমায়া স্নান সেরে নিল। অগণিত যাত্রীর ভিড়। তবে দেখলাম মহিলাদের স্নানের আকুতিই বেশী। আমরা গৌরী কুণ্ডের জল মাথায় নিলাম। গৌরীকুণ্ডের আরেক নাম গৌরী তীর্থ। এখানে গৌরীদেবীর মন্দির আছে। মহাদেবের গা থেকে যে স্বেদ নির্গত হয়েছিল সেই স্বেদবিন্দু থেকে এই তপ্ত কুণ্ডের সৃষ্টি। শুধু তপ্ত কুণ্ড নয় শীতল কুণ্ডও আছে। গণেশের জন্মস্থান রূপেও এই তীর্থ প্রসিদ্ধ। গহ্বরের মুখ থেকে তপ্ত জল অবিরাম ধারায় কুণ্ডের মধ্যে পড়ছে।

চারিদিকে পাহাড় ঘেরা এই মনোরম তীর্থ। গৌরী তীর্থের কাছ দিয়ে মন্দাকিনী প্রবাহিত। গৌরী তীর্থের পূজারী তীর্থ মাহাত্ম্য বলে চলেছেন যাত্রীদের কাছে। ছটি পিতলের সিংহের মুখ দিয়ে জলধারা তীব্রবেগে এসে পড়ছে। কুণ্ডটী সব সময় ধুমায়িত। প্রথমে দেখলে মনে হয় খুব গরম, নামা যাবে না কিন্তু একবার নামলে খুব আরাম হয়। তাতে আবার শীতের দেশ। থাক বাজে কথা ছাড়বে, তাড়াতাড়ি তাই আমরা আবার রওনা হলাম শোন-প্রয়াগের দিকে। পিছন পানে তাকাই, দেখি চটিগুলি যাত্রীতে ভরে উঠছে, আবার ক্ষণিকেই খালি হয়ে যাচ্ছে। বেলা দশটার সময় শোন প্রয়াগে এসে পৌছলাম। বাসে এসে বসে আছি, একে একে সব যাত্রী এসে বাসে উঠল কিন্তু বোম্বাই থেকে এক পরিবার এসেছেন তারা এখনও এসে পৌছায়নি, বাস ছাড়তে পারছে না। অপেক্ষা করতে করতে প্রায় তিনটে বেজে গেল, এমন সময় খবর পাওয়া গেল ভদ্রলোক বর্ণার জলে পিছলে পড়ে ওঁর হাত ভেঙেছে। তাকে মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অ'ঙ্কের মত আমাদের ফেরার কোন আশা নেই। সারাদিন বাসে বসে থেকে শেষে সন্ধ্যার সময় হোটেলের একটী কাঠের ঘর ভাড়া নেওয়া হল। ভাড়া নিলাম এক রাত্রিতে পঁচিশ টাকা। হোটেল মানে আমাদের দেশের মুদিখানা। তাতেই চেয়ার টেবিল পেতে যাত্রীদের খেতে দিচ্ছে। কোথাও বা রাস্তার সামনে যাত্রীদের বসিয়ে বড় বড় থালায় করে খিচুড়ী খেতে দিচ্ছে।

সুধনাদির মুখে শোন প্রয়াগের গল্প শোনা আছে আগে থেকে। কাজেই যাবার সময় আমরা শোন প্রয়াগে থাকি নি, কিন্তু শোন প্রয়াগ তার অভিজ্ঞতা আমাদের একটু আস্বাদন না করিয়ে ছাড়লো না। বাথরুম পায়খানার অবস্থা দেখে মন্টু বলে সব তীর্থ বার বার শোনপ্রয়াগ একবার। মাল পত্র সব বাসের মাথায় উঠল শুধু রাত্রির যোগাড় ও একটা করে গায়ের কম্বল নিয়ে আমরা কাঠের ঘরে আশ্রয় নিলাম। নেমে আসে সন্ধ্যা। অত যাত্রী নেমেছে সবাই দিশাহারা হয়ে ঘর খুঁজছে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে নানা রকমের সিনেমার গান। যার যা প্রাণ চাইছে সে সেই রকম গান করছে। আমরা স্টোভে মাংস চাপালাম। চাল ও সবজি একসঙ্গে ঘি দিয়ে চাপানো হল। এর মাঝে যোগমায়া বলে 'তুই বলুই দে' আমি বলি 'দূর বোকা।' তাতে—কেউ বলুই দেয় না। দুজনে চলে

তর্ক। শেষে ঘন্টু বলে 'আহা হনুর দিতে বলছে যোগমায়াদি যেন যাদু, সব গোলমাল মিটে যাবে।' শেষে হনুর দেওয়া হল। রান্নাও বাকল। ডেকচি সমেত ঠাকুরকে তোলে দেওয়া হল কিন্তু এখন খাওয়া হবে কি উপায়ে খাবার পাতা ত' বাসের মাথায়। ঘন্টু বলল, দাঁড়ান এই বলে দোকান থেকে কতগুলো বাঁধাকপির পাতা নিয়ে এল আর তাতেই করে আমরা আবার সাদ করলাম। সারাদিনের ক্লান্তি আর খিদে, প্রসাদ যা মিষ্টি লাগলো তার কোন তুলনা নেই। আমাদের সহযাত্রী অনুপের মা বলতে লাগলেন 'দেখেছ মায়েরা কত বাহাদুর; মায়েদের রান্না হল, খাওয়া হল আর আমাদের হোটেলের খোঁজ মিলছে না। খাওয়া সেরে নিয়ে আমি ও যোগমায়া আমাদের ঘরের সামনেই খোলানো ছোট একফালি বারান্দা সেখানে এসে বসলাম। নীচেই খাদের মধ্যে দিয়ে খরস্রোতা বয়ে যাচ্ছে গর্জন করে। ছোট্ট একটা বাঁশের সেতু। সেতু পার হলেই গগন চুম্বী পর্বত। পর্বতের গায়ে গায়ে হেঁটে যাবার রাস্তা। চাঁদের ঝাপসা আলোয় দূরের পানে হারিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। ক্রমে থেমে আসে সব কোলাহল। আমরা উঠে এসে আশ্রয় নিলাম কম্বলের তলায়। যদিও জুন মাস তবুও শীত বেশ প্রখর। ঠাকুরের মূর্তি বুকে নিয়ে ঠাকুরের অনুধ্যান করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে উঠে আবার চলে রওনা হবার প্রস্তুতি। যে যার সে তার বাস পত্র গোছাতে ব্যস্ত। আমরা চা খেয়ে নিয়ে বাসে এসে বসলাম। সব যাত্রী এসে বাসে উঠলে বাস আমাদের নিয়ে রওনা হল যন্ত্রী নারায়ণের পথে, দেখতে দেখতে আমরা এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ায় এসে উঠলাম। বাস এগিয়ে চলেছে। বেলা বারোটা নাগাদ আমরা কাটা স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। কিন্তু তখন গেট খোলেনি কাজেই এখনকার মত এখানেই যাত্রার বিরতি। ক্রমে অনেকগুলি বাস এসে জড়ো হল। আমরা বসে আছি। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘন্টুকে জিজ্ঞাসা করি 'কিসের শব্দ হচ্ছে।' ঘন্টু বলে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরী হচ্ছে। এমন সময় টেলিফোন এল সৈন্য বিভাগের অফিসে প্রচণ্ড ধস নেমেছে এখন গেট যেন বন্ধ থাকে। বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। প্রায় দু ঘন্টা লাগবে রাস্তা পরিষ্কার করতে। ঘন্টু বলল, 'আরাধনাদি কিছু আগে যে শব্দ শুনেছেন ওটা ডিনামাইটের শব্দ নয় ওটা ধস নামার শব্দ।' রওনা হতে দেরী আছে দেখে অপর্ণা আমরা স্নানের ব্যস্থা দেখে পড়ি বাস থেকে, প্রায় আধঘণ্টা খোঁজার পর একটি ঝর্ণার ধারে দেখা গেল স্নানের ব্যবস্থা রয়েছে। সারি সারি সেকটিক পায়খানা রয়েছে। আমরা ঝর্ণার জলে স্নান সেরে আবার বাসে এসে বসলাম। বেলা প্রায় দুটোর সময় মিলিটারী টিপ এল খবর নিয়ে। গেট খুলে গেল ক্রমে বাসগুলি আবার রওনা হল গন্তব্য পথে। বাস এগিয়ে চলেছে পিছন পানে চেয়ে দেখি অসংখ্য চূড়া থেকে বাসগুলো নেমে আসছে ঠিক ঝর্ণার জলের মত। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গোলাপের ঝাড় পথের দিকে ঝুঁকে পড়ে যাত্রাপথকে করে তুলেছে পুষ্পলাবী। —কোথাও বা আপেলের ঝাড় এসে ঝুঁয়ে পড়েছে পথের ধারে। আর একদিকে খাদের মধ্যে থেকেই চলেছে অনর্গলধারায় নৃত্য, মুখর সঙ্গীত পরিবেশন। এ পথ যত ভয়ঙ্কর তত মধুর। বাস যত এগিয়ে চলেছে ততই দেখা যাচ্ছে বৈচিত্রময় দৃশ্য। যাত্রীদের চোখে চমক লাগে। হঠাৎ দেখা যায় পানচাকলী। বহুদিন আগে ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছিলাম আজ দেখলাম নিজের চোখে পাহাড়ের গায়ে ঝর্ণার জল যেখানে সজোরে বেরিয়ে আসছে তার সামনে ছোট একটী ঘর। ঘরের মধ্যে জাঁতা লাগানো। ঝর্ণার জলের বেগে জাঁতা ঘুরছে আর একটি লোক বসে গম পিসে নিচ্ছে। নতুন জিনিষ। গহন গিরি কন্দর সেখানেও মানুষ বুদ্ধির বলে খাদ্য সমস্যার সমাধান করছে।

বিগত দিনের ধসে ভেঙে যাওয়া রাস্তা মেরামত করবার জন্য মিলিটারী গাড়ি মাল মসলা নিয়ে ছুটাছুটি করছে। আমরা আরো এগিয়ে গেলাম, দেখি একটি মিলিটারী গাড়ি এগিয়ে আসছে দেখে মনে হল তার খুব তাড়া রয়েছে। মিলিটারি গাড়িটা এগিয়ে এলে তার চালক বলল, আমাদের বাসের ড্রাইভারকে 'বে রাস্তা কর দাও আমরা পাহাড়ের গা ঘেঁসে যাব। আমাদের ড্রাইভা

বলল, আমার গাড়ি বড়, তুমি বার দিয়ে যাও। সব কথাই চলে ছিল্লিতে। পথ অতি সংকীর্ণ, বিরাট সমস্যা দেখা দিল। অগত্যা আমাদের বাস কিছু হটতে লাগল হঠাৎ সব যাত্রীরা চেঁচিয়ে ওঠে হোক্‌কে হোক্‌কে। আমাদের বাসের একটী চাকা প্রায় পথের সীমানার বাইরে আর একটু হলেই বাস একেবারে খাদে গিয়ে পড়ত। রাখে হরি ত মারে কে? যাত্রীরা ভয়ে স্তম্ভিত। পাণ্ডাজী যাত্রীদের নাম করতে শুরু করলেন। সকলে উচ্চৈস্বরে নাম করছে। নাম করতে করতে মাঝে মাঝে সকলে একটু থেমে যাচ্ছে। পিছনের সিটে বসে থাকা অনুপের মা তিনি খুব রসিক। যখনই পাণ্ডা ও যাত্রীরা নাম পাল্টিয়ে দিচ্ছে তখনই বলে উঠছেন পাণ্ডাজী অব ছড়াই হায় আপ বলিয়ে "জয় বদ্রীনারায়ণ কী জয়" অমনি জয় ধ্বনীতে বাস মুখরিত হয়ে উঠছে। নাম মুখরিত বাস ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ওদিকে বেলা পড়ে আসছে সন্ধ্যার আগে যোশীমঠে পৌছবার কথা। কিন্তু পৌছানো যাবে কিনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সহসা নামে বৃষ্টি। পথের নিশানা যাচ্ছে হারিয়ে। ধোঁয়ার মত চারিদিক ঢেকে যাচ্ছে। বাস খুব আস্তে এগোচ্ছে। যতটুকু এগোচ্ছে ততটুকু পথ দেখা যাচ্ছে বাকী পথ অদৃশ্য। মেঘের পানে চেয়ে আছি মনে পড়ে যাচ্ছে ঠাকুরের গান, 'চকিত মেঘ-আলোতে ঢেকেছে দিক রেখা, জীবন পথ বেয়ে চলিছে একা একা। আবার কখনও মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের গান— 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে "আমায় কেন বসিয়ে রাখো একলা পথের পথের পাশে"।' পাহাড়ে তখনই প্রবল বরিষণ আবার ক্ষণিকেই মেঘ যায় সরে কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামল। কিন্তু পথ এখনও অনেক বাকী। আজ আর হয়ত যোশীমঠে পৌছানো যাবে না।

ডঃ চাঁদুর

শুভঙ্করী আঁকে যাঁর ধাঁধা লাগতো (৭)

বসিরহাট
কার্তিক ১৩৮৩

মানিকবনের প্রিয় সাথীরা,

শুভ বিজয়ার শ্রীসত্যানন্দ প্রীতি শুভেচ্ছা সকলে নিও। আশা করি, মার কৃপায় এবার পুজো তোমাদের বেশ আনন্দে ও নিবিঘ্নে কেটেছে। পুজোর চিঠিতে আমরা বৃন্দাবনে ছিলাম। এবার কামারপুকুরে ফিরে আসছি—মানিকরাজার পুজা মণ্ডপে। শ্রাবণের চিঠিতে পড়েছিলে মানিকবনে গদাধর গোপালের ক্ষুধার্ত হয়ে কল্যাণীর কাছে খেতে চাওয়ার দিব্যলীলার কথা। বলে-ছিলাম, কামারপুকুরে গদাধরের বাল্যলীলার সঙ্গে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাল্যলীলার খুব মিল। প্রসঙ্গত এই মিলের দিকটাই একটু তুলে ধরার জন্যে পুঁথি সংখ্যার তোমাদের কৃষ্ণের ব্রাহ্মণ পত্নীদের কাছে ক্ষুধার্ত হয়ে অন্ন ভিক্ষে চাওয়ার মধুর লীলাটি বর্ণনা করেছিলাম। দুই অবতার রূপের এ দুটী বাল্যলীলার মধ্যে কি অদ্ভুত মিল তা তোমরা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছো। শ্রীঅর্চনা দাও তাঁর "শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্যে" লীলা দুটীর অপূর্ব মিলের কথা স্মরণ করে গদাধরের বাল্যলীলা বর্ণনা কালে কৃষ্ণলীলা-চিত্রটিও এঁকে দিয়ে বলেছেন লেকথা—"

"সে দিন যে ছবিটি হল আঁকা
যুক্ত প্রান্তর কোণে,
তাহারি রঙ যেন আছে মিশে
এ নব লীলাটীর সনে।"

অর্থাৎ যমুনার তীরে যুক্ত প্রান্তরে সেদিনের কৃষ্ণ গোপালের লীলার ভাব রঙটিই যেন এযুগে মানিকবনে গদাধর গোপালের নবলীলার রূপে আছে মিশে।

কৃষ্ণলীলায় দেখলাম, ব্রাহ্মণরা জ্ঞানী, তপস্বী হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণের কৃপার ছলটি ধরতে বুঝতে পারলেন না। তাঁরা অন্ন ভিক্ষা দিলেন না। কিন্তু তাঁদের সহধর্মিণীরা সব বাধা ঠেলে ফেলে দিয়ে খাবার ভর্ত্তি থালা হাতে ছুটলেন কৃষ্ণের সেবা ও দর্শন আকুলতায়। শুধু অচলা ভক্তি বিশ্বাসের জোরে তাঁরা কৃষ্ণের দর্শন পেলেন, কৃষ্ণ কৃপাধন্য হলেন। সদাধর গোপালের লীলাতেও দেখ মানিকরাজার মেয়ে কল্যাণী সরল বিশ্বাস আর ভক্তি দিয়েই গদাইকে গোপাল বলে চিনেছিল বলেই তো দেবীর ভোগ না হতেই ভোগের অগ্রভাগ জীবন্ত জাগ্রত দেবতা গদাইকে খাইয়ে দিয়ে গেল পরমানন্দ। কিন্তু বাড়ীর সকলেই তো কল্যাণীর মত নয়। সবারই গদাই-এর ওপর কল্যাণীর মত গভীর ভক্তি বিশ্বাস থাকবে তা তো আশা করা যায় না। রাজবাড়ীর কর্মচারীদের মধ্যে একজন কেউ দেখে ফেলেছিল কল্যাণীর গদাইকে ভোগ তুলে দেওয়ার ব্যাপারটা। সে মানুষটিই সাত কান করে ছড়িয়ে দিলে খবরটি। রাজবাড়ীতে পুজো-আহ্নিকে প'ড়ে গেল মহা হৈ-হৈ রৈ রৈ। একি অনাসৃষ্টি অনাচার! দেবীর পুজো বলে কথা। কখন এমন হয়নি—পুজো না হতেই দেবীর ভোগ একটা ছেলেকে কল্যাণী খাইয়ে দিলে! এত বড় সাহস! দেবীর পুজো নিয়ে ছেলে খেলা! কথাটা পুজোর উদ্যোক্তা গৃহকর্তা মানিকরাজার কানেও গেল। শুনে তিনি কি করলেন সে কথা বলার আগে এখানে একটা কথা একটু বলে নি—দেখ, দুর্গা পুজো বাঙালীর জাতীয় পুজো, মহাপুজো। এতে নানা নিয়মনিষেধ বড় নিষ্ঠার সঙ্গে মানতে হয়। পান থেকে চুণ খসলেই পুজোর অঙ্গহানি হবে—এ ভয় থাকে সব সময়। কাজেই এ পুজোয় সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলেই লোকের মনে একটা অমঙ্গল আশঙ্কা আপনা থেকেই জেগে ওঠে। পুজোর আচার নিয়মের একটু এদিক ওদিক হ'লেই লোকে ভয় পায়। নইলে দেখ না, যে বাড়ীর সবাই গদাইকে এত ভালবাসে, মানিকরাজার ভাই রামজয় যাঁকে মানুষ জ্ঞান করতে নিষেধ করেছেন, যাঁকে দুদিন না দেখলে বাড়ীর সকলে দেখার জন্যে ছটফট করে, রাজা নিজে ব্যাকুল হয়ে যাঁকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে সদা ক্ষুদিরামকে চিঠি লিখে পাঠান, সকলের প্রিয় সেই দেব বালককেই তো দেবীর পুজোর ভোগ আগে ভাগে দিয়ে দিয়েছে কল্যাণী জীবন্ত-জাগ্রত দেবতা জ্ঞানে, কিন্তু বাড়ীর আর সবাই বাস্তবক্ষেত্রে গদাইকে সেভাবে নিতে পারল কই? মহাপুজোর ত্রুটি হ'ল, না জানি কি অমঙ্গল ঘটবে, এই আশঙ্কায় সকলে তখন অস্থির হয়ে উঠল। গদাইকে দেবতা জ্ঞান করতে পারলে তো আর এ ভয়টা আসে না। কিন্তু তা হবার নয়। তাহলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কৃপার প্রশ্ন। কৃপাময় যাকে কৃপা করবেন সে ছাড়া ঐ অচিন দেবতাকে চেনে সাধ্য কার। কথা আছে না "ওরে কৃপী লব করিল কি গৌরব ধরা না দিলে পারিস কি ধরিতে।" কাজেই সাধারণ ক্ষেত্রে মানুষ জ্ঞান এসে পড়েই। এই হল মুস্কিল। কৃষ্ণলীলায় দেখলে তো, ব্রাহ্মণরা জ্ঞানী, তাঁরা শুনেছেন কৃষ্ণের আবির্ভাবের কথা, তাঁর অদ্ভুত সব লীলার কথা, তা সত্ত্বেও সেই কৃষ্ণ যখন রাখাল সখাদের দিয়ে দুটী অন্ন ভিক্ষা চেয়ে পাঠালেন, তাঁরা শুনেও শুনলেন না সে কথা। ধরতে পারলেন না কৃষ্ণের কৃপা! কারণ একই। ঐ ব্রাহ্মণদের তখন কৃষ্ণে ভগবান বোধ জাগে নি। শুধু জ্ঞানের অহংকারে, পাণ্ডিত্যের অভিমানে কৃষ্ণে মানুষ জ্ঞান এসে পড়েছে তাঁদের।

মানিকরাজারও হ'ল তাই। তবে সেটা ঠিক জ্ঞানের বা পাণ্ডিত্যের অহংকারে নয়, স্নেহ ভালবাসার মায়ার টানে। মানিকরাজা গদাইকে অতি স্নেহ করেন ভালবাসেন। সেই স্নেহ ভালবাসার মায়ার ফাঁদে ফেলে দিলেন ঠাকুর তাঁকে। মানিকরাজা ধরতে পারলেন না ঠাকুরের কৃপা। ঠিক সেই মুহূর্তে গদাইকে দেবতা জ্ঞান করতে পারলেন না। মানুষ জ্ঞান চলে এল। গদাই তখন সদা ক্ষুদিরাম চাটুয্যের শিশুপুত্র মাত্র, তাঁদের আদরের ধন, নয়নমণি—এই পর্যন্ত। তাঁকে তাঁরা প্রাণাধিক ভালবাসেন বলেই জেগে উঠল মহাপুজোর ত্রুটির ভয়। গদাইকে পুজোর ভোগ আগেভাগে কল্যাণী খাইয়ে দিয়েছে শুনেই স্নেহান্ধে তিনি গদাই-এর অমঙ্গল আশঙ্কায় বলে উঠলেন, "ছিঃ ছিঃ! এ তুই কি সর্বনাশ করলি কল্যাণী!

দেবীর ভোগ না হতেই তা তুই গদাইকে খাইয়ে দিলি? এ যে দেবীর চরণে মহা অপরাধ করলি মা! গদাই-এর যদি কিছু অমঙ্গল হয়?"—বলে মুখ বকলেন কল্যাণীকে। বেচারী কল্যাণী মাথা হেঁট করে অশ্রুল নয়নে নীরবে সইলো পিতার সব তিরস্কার, সবার সব ধিক্কার অপমান, শুধু বুকে জেগে থাকা একটি দেবশিশুর হাসিমুখের কৃপায় যন্ত্রণাটুকু সহন নিয়ে।

এদিকে অমঙ্গল ভয়ে ভীত অপরাধীর মত ধানিকরাজা তখন ছুটলেন দেবীর পূজো মণ্ডপের দিকে। যেতে যেতে কেবল ভাবছেন—এ মহা অপরাধের ক্ষমা নেই, কি জানি এবার কি বিপদ ঘটবে, কি অমঙ্গল আসবে—তাই মার চরণে চোখের জলে ক্ষমা প্রার্থনা করে আসি।

"হয়েছে অপরাধ দেবীর পায়
কি জানি ঘটে পরমাদ
গণিয়া শঙ্কিত ধানিকরাজ,
যাচিতে ক্ষমা পরসাদ,
ছুটিল মন্দিরে দ্রুতবাস
অঙ্গ থরথর ভাবে—
কহিল হে জননী কর ক্ষমা
অকৃতী তব দীন দাসে,
মিনতি কত শত আকুতি হায়
যে দেবী কর দয় জানী
পাষাণ মূরতির পাষাণ পায়
কাঁদয় কত মাথা কুটি।"[১]

মার চরণে মাথা কুটে চোখের জলে আকুল হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন ধানিকরাজা। এমন সময় দেখেন, পাষাণ মূর্তি হঠাৎ যেন অতি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। "একি! একি দেখছি! দেবী যে দশ হাত দিয়ে সামনে থরে থরে সাজানো ভোগের উপচার তুলে নিয়ে নিজে গ্রহণ করছেন মহা আনন্দে! কি অপূর্ব দিব্য হাসি মাখা শ্রীআনন দেবীর! কিন্তু এ তো দেবীর মুখ নয়! এযে অবিকল হাসি মাখা এ কার মুখ"! অবাক বিস্ময়ে দেখেন রাজা—দেবীর সেই

"চাঁচর চিকুরে চাঁপা ফুল,
কোথায় ত্রিলোচনী তিলক ভাল?
শ্রীমুখে চন্দন গুঁড়া
চপল আঁখি পানে চাহিলে হায়
অচিন কূলে ভেসে যেই,
যুগে যুগের যেন চির চেনা
চক্রাচোর এতো সেই।"[২]

দেবীর সেই বিরাট প্রভা কোথায় গেল? এযে দেখছি মাথায় চূড়ো বাঁধা সিঙ্গর চাঁচর কেশ। কপালে ত্রিনয়ন কই? মুখে তো চন্দনের ফোঁটা আঁকা। এ যে আমাদের চির চেনা গদাই সোনার চাঁদ মুখ। সেই তো দেখছি দেবীর দশ হাত দিয়ে নিজে দেবীর ভোগ। —দুর্গা প্রতিমাতেই গদাই কিশোরের এই অপূর্ব দেবদর্শন পেয়ে ধানিকরাজা আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর চোখের ওপর থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল, জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। তিনি সোল্লাসে সকলকে ডেকে সোচ্চারে বলে উঠলেন, ওরে, তোরা সবাই শোন্, শোন্, গদাই আমাদের মানুষ নয়রে, গদাই মানুষ নয়। গদাই দেবতা। গদাই আর মা দুর্গা, এক এক! কল্যাণী! মা তুই-ই চিনেছিস্। তুই ধন্য। আমিই করেছি অপরাধ।

এতদিন একথা বুঝেও না বোঝার অপরাধে ধানিকরাজা এখন অনুতাপে জ্বলছেন। নয়নে ঝরছে অবিরাম ধারা—

"নয়ন বারি নাহে শ্রাবণ ধার
ধিক্কার অনুতাপে জ্বলা—
বুঝেও না বোঝার যে অপরাধ
তার কি আছে হায় ক্ষমা।"[৩]

ধানিকরাজার কি ভাগ্য বল দেখি, মনে পড়ছে বহু উঁচু সেই দুটি লাইন—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গৌর রায়
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

ধানিকরাজা সত্যিই মহাভাগ্যবান। তাই তিনি গদাধর গোপালেরই দেখলেন এমন অপূর্ব দর্শন। গদাইকে তিনি ভালবেসেছিলেন বলেই তো ঘটল এমন অপূর্ব লীলা। তাই

যদি ভাই, ঐ অচিন ঠাকুরটিকে ধরতে যদি চাও তো খেলার সাথী সখা বন্ধুরূপে যে ভাবেই হোক তাঁকে ভালবাস। ভালবাসার টানে তাঁকে ধরা দিতে, আসতেই হবে সেবে। জয় ঠাকুর! জয় মা! ইতি—

তোমাদের
বড় বন্ধুর

১। শ্রীরামকৃষ্ণ বচনামৃত,—শ্রীঅর্চনাপুরী

আশ্রম সংবাদ

১৪ই সেপ্টেম্বর '৭৯, শুক্রবার ছিল ষোল নবমী—আমাদের পরমগুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর ১১৩তম পুণ্য আবির্ভাব তিথি। এই উপলক্ষে বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দু'দিন ব্যাপী স্মরণোৎসবের সূচনা হ'ল মাঙ্গলিক সানাই-এর প্রভাতী সুরের অর্ঘ্য দিয়ে। সকালেই আশ্রমের সাধু ও ভক্তরা এবং আশ্রম বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা কাশীপুর মহাশ্মশানে গিয়ে অভেদানন্দজীর মহাসমাধিপীঠে ফুলের মালা দিয়ে এবং ভজন গেয়ে ধূপদীপে আরতি করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আসেন। এরপর ঠাকুরের বাণীমন্দিরে সঙ্ঘসচিব পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীর পরিচালনায় সাধু ও ভক্ত সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র। শ্রীগীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, যুগে যুগে তার আসা, যুগাচার্য, আমার জীবন কথা, প্রবন্ধসঙ্কলন, জননী সারদেশ্বরী, বেদান্ত-ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ হয়। সত্যানন্দজী পাঠের আগে ও শেষে আমাদের ঠাকুর ও অভেদানন্দজীর দিব্য মূর্তিচারণ পরিবেশন করে সত্যানন্দ-অতীত আনন্দে ভরিয়ে তোলেন ভক্ত মন। আশ্রম বিগ্রহে চণ্ডীপাঠ, আরতি, হোম ও পুষ্পাঞ্জলিসহ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা মা, শ্রীবিশ্বজননী মা, সঙ্ঘস্থিতা শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব ও পরমগুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজান্তে বহু ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ অন্ন প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হন। উৎসবের দ্বিতীয় দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সন্ধ্যায় বাংলার বিশিষ্ট কবি সমাবেশে কবি সম্মেলন। বন্দনাগীতি ভজন ও উদ্বোধন সঙ্গীতের পর আশ্রমের কবিতা পাঠ দিয়ে সুরু হয় অনুষ্ঠান। প্রথমেই ঠাকুর সত্যানন্দদেবের কবিতা আবৃত্তি করেন স্বামী কৃপানন্দ। তারপর পঠিত হয় শ্রীঅর্চনাপুরী মা'র কবিতা। শ্রীঅর্চনাপুরী মায়ের কবিতা পাঠ করেন কৃপানন্দজী। শ্রীঅর্চনা মার কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন আমাদের পরম গ্রন্থের জ্যোৎস্নাদা (শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক)। সকলের অনুরোধে সেটিও পাঠ করে শোনান অনুবাদক নিজে। স্বামী অকলানন্দের স্বরচিত কবিতা পাঠের পর ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিকঙ্কন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, শ্রীতুলসী মুখার্জী, শ্রীঅমল কৃষ্ণ গুপ্ত, শ্রীমতী বেলা দেবী, শ্রীমতী রেণুকা মিত্র, শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য, শ্রীশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, শ্রীবীরেন বসু, শ্রীরমেন মল্লিক, শ্রীসুধেন্দু মল্লিক প্রভৃতি বাংলার খ্যাতনামা কবিদের কণ্ঠে তাঁদের কবিতা-পাঠ শুনে শ্রোতারা হন আনন্দিত। কবিতা পাঠে পূর্ণচ্ছেদ টানলেন স্বামী কৃপানন্দ নিজের লেখা একটি কবিতা শুনিয়ে। স্বামী অকলানন্দের কণ্ঠ সঙ্গীতে ঘোষিত হল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। সম্মেলনে পৌরহিত্য করেন ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত: প্রত্যেকের কবিতা পাঠের পর কবিতা সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত সরস মন্তব্য অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিল।

অভেদ-তিথি পূজার ১০।১১ দিন পরেই বরানগর সেবাশ্রম আশ্রম আবার সরগরম হয়ে উঠল শারদোৎসব আনন্দে। উৎসবের সূচনা হ'ল ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে শ্রীঅর্চনামার লেখা ঘরকাঙ্গীন নাট্যাভিনয় দিয়ে। স্বামী তত্ত্বেশানন্দের পরিচালনায় "চাঁদনী-সঙ্ঘের" ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের অভিনয় নৈপুণ্য-গুণে নাটকের আবেদনটী বেশ সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছিল।

২৭শে মহাষষ্ঠী। সুরু হ'ল দুর্গতিনাশিনী দেবীদুর্গার মহা-পূজা। গত বছরের পুজোর কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। সারা পশ্চিম বাংলা তখন বন্যাবিধ্বস্ত। বন্যাতঙ্কের আর্তনাদ ভরা বেতন আসবনী দিয়ে ঘেরা ছিল যার আবাহন। মহারঙ্গে মে. মা আমাদের ঐরকম ভয়াবহ বিপদে এবার আর ফেলেন নি। যাঁরা বরাবর পুজো করেন—সিউড়ী আশ্রমের স্বামী নীলানন্দজী, স্বামী সুরেশ্বরানন্দজী ও স্থপতি শ্রীগৌরীশঙ্কর চৌধুরী—তাঁরা সকলেই এবার যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে চারদিনের মহাপূজা পূর্বের মত সুচিন্তিত দিব্য ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুসম্পন্ন করেন। আশ্রমের নিত্য পূজিত বিগ্রহ দ্বিভুজা শ্রীসারদা মাই দশপ্রহরণে সেজেগুজে দশভুজা দুর্গা হয়ে সিংহাসন আলো করে বসেন। ষষ্ঠী-সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন যথাক্রমে উমা-মহেশ্বরী, যোগিনী ও রাজরাজেশ্বরী রূপে মার অপরূপ বেশ দর্শন করে নয়ন সার্থক করেছেন অগণিত দর্শনার্থী। একশো আটটি ঘিয়ের প্রদীপে মহাষ্টমীর সন্ধিপূজারীতিও তো ভোলবার নয়। মন ভরে গেছে অষ্টমী ও নবমীর দিন অভাবনীয় ভক্ত সমাবেশ দেখে। এবারও পুজোয় বেশ কিছু সার্ট, প্যান্ট, ফ্রক, জামা, কাপড় ইত্যাদি নতুন বস্ত্র পেয়ে বহু দরিদ্র শিশুনারায়ণদের মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠতে দেখে সকলেই আনন্দ পান। দশমীর দিন সকালে দশমী বিহিত পূজা ও তর্পণে বিসর্জনের পর শান্তিবারি মাথায় নিয়ে ভক্তরা নিলেন মার মঙ্গল আশিস। গঙ্গায় পট বিসর্জন দিয়ে এসে সাধু ভক্তরা লাঠিখেলা, ধুনুচী নৃত্য ও নামগানে প্রণাম জানালেন ত্রিনয়নী মা ও ঠাকুরের চরণে। সন্ধ্যায় বিজয়া সম্মেলনে প্রণাম, আলিঙ্গন, প্রসাদ প্রসরণের আনন্দ-স্মৃতি নিয়ে শান্ত হ'ল এবছরের শারদোৎসব।

শুভেচ্ছা

ভাবমুখের সকল পাঠক/পাঠিকা, লেখক/লেখিকা গ্রাহক/গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষিগণকে জানাই শুভ বিজয়া দশমী ও দীপাবলীর শ্রীসত্যানন্দ-প্রীতি-শুভেচ্ছা।

সম্পাদক

ভাবমুখে

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস

(শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত)

(শান্ত এবং পাঠানুকূল আশ্রমিক পরিবেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত আবাসিক ভবন)

কেবলমাত্র পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন।

(১৫ই ডিসেম্বর '৭৯ এর মধ্যে।)

২নং, রামকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৬

ফোন : ৫২-৭১৩৩

হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু, সরস্বতী, বিদ্যাবারিধি

(অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি—কলিকাতা হাইকোর্ট)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

মুমুক্ষা

সংসারের নানাবিধ দুঃখের পীড়নে সাময়িক বৈরাগ্য অনেকেরই হয়, কিন্তু তবুও ভবিষ্যতে ঐহিক সুখের আশা আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে ; ফলতঃ সংসারচক্র হইতে মুক্তির অকৃত্রিম ইচ্ছা বা সঙ্কল্প অতি অল্প লোকেরই হয়। এজন্যই 'মুমুক্ষুত্ব' মনুষ্যজগতে সুদুর্লভ বলা হইয়াছে।[১৪] অথচ মুমুক্ষুত্ব উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম জীবনের আরম্ভই হইল না ; মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য যে সাধনা করিতে হইবে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে কত যুগ, কত জন্ম, কাটিয়া যাইবে কে জানে।[১৫] কারণ, সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ[১৬] হওয়াই তাহার উপকরণ, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। নানাবিধ কামনাই আমাদের 'হৃদয়-গ্রন্থি,' যাহা আমাদিগকে ধর্ত্তা পৃথিবীর সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অমৃতত্ব বা মুক্তির একমাত্র উপায় হইতেছে, নিঃশেষে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে পুষ্ট সমুদয় বাসনা বর্জন পূর্বক সেই হৃদয় গ্রন্থি সমূহকে ছিন্ন করা।[১৭] অপর কথায়, অবিদ্যা-জনিত দেহাত্মাভিমান এবং বিষয়াসক্তিরূপ যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছাকেই বলা হয় মুমুক্ষা বা মুমুক্ষুতা।[১৮]

বৈরাগ্য বা মুমুক্ষা যাহার আদৌ হয় নাই, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে কোনও সাধনই মোক্ষপ্রাপ্তি বা আত্মজ্ঞানের সহায়ক হইতে পারে না।[১৯] এরূপ ব্যক্তির পক্ষে শম-দমাদি সাধন ভান মাত্র বা কপটতা হইবে।

চিত্তশুদ্ধি

ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মদর্শনের জন্য চিত্তশুদ্ধি একটি আবশ্যিক প্রস্তুতি ইহা সহজেই অনুমেয়।[২০] যেমন মুকুরে মলিনতা থাকিলে প্রতিবিম্ব সুপরিস্ফুট হয় না, সেইরূপ বিশুদ্ধতম সত্ত্বের ধারণা করিতে হইলে সাধককে সত্ত্বশুদ্ধ[২১] হইতে হইবে। ইন্দ্রিয়াদি এবং বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে তবেই আত্মা প্রকাশিত হন।[২২]

পরমাত্মা জীব মাত্রেরই অন্তরেই অবস্থিত আছেন, কিন্তু অবিদ্যাতাড়িত ও বিষয়াক্লিষ্ট চিত্তে তাহা প্রতিফলিত হয় না। চিত্ত শুদ্ধ ও ধৈর্য্য সম্পন্ন হইলেই নিজের স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা যায়।[২৩] এবং তখন উপলব্ধি হয় যে যিনি বাহিরে তিনিই ভিতরে।[২৪]

প্রসঙ্গান্তরে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব সম্পাদনই আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্য।[২৫] 'তত্ত্বমসি'[২৬] মহাবাক্যেই এই একত্ব বিঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ আমরা নিজেদের স্বরূপ জানিতে পারি না এবং মায়াজালের অন্তরালে অবস্থিত 'তৎ' এর প্রকৃত সত্তাও উপলব্ধি করিতে পারি না। এই অবিদ্যা ও মায়ার যবনিকা অপসারিত করিবার জন্যই নির্ম্মল দৃষ্টির প্রয়োজন এবং তাহার জন্যই 'শুদ্ধসত্ত্ব' হইতে হইবে। শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারিলে প্রকৃত বোধ হইবে, আমিই সেই তিনি—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ; তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐরূপ উক্তি করিলে কপটাচার হইবে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের প্রায় সবটাই হইতেছে এই শুদ্ধসত্ত্বসাধনের উপায় নির্দ্দেশ। ইহার প্রতিটি ধাপেই সাধক ক্রমশঃ লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবেন। এই সকল পদক্ষেপের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রয়াস এই পুস্তিকায় করা হইতেছে। সিদ্ধি অবশ্য কোনও অধ্যয়নের দ্বারা আয়ত্ত হইতে পারে না ; তজ্জন্য চাই সদ্‌গুরুর দুর্লভ সঙ্গলাভ এবং সাধকের জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী সাধনা।[২৭]

(ক্রমশঃ)

১৫। শ. বি.—(ক 'দুর্লভং……মহত্তত্ত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ'।
গী (৬।৪৫)— …অনেক জন্মসংসিদ্ধঃ…পরাং গতিম্'।
গী (৬।৪৫)—' ……সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ……'॥
ক (২।৩।১৪-১৫) ; মু (৩।১।৭) 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে …অনুশাসনম্'।
শ. বি. (২৭) 'অহঙ্কারাদিদেহান্ত…মুমুক্ষুতা।'
শ বি. (৩০)—'এতন্মোর্মন্যতা…ত্র শব্দাদের্তান মাত্রতা'।
ছা (৭।২৬।২)—' সত্ত্বশুদ্ধৌ……বিপ্রমোক্ষঃ'
মু (৩।১।৮-৯)—'……বিশুদ্ধ সত্ত্বস্তত্র তং পশ্যতে নিষ্কলং বিশুদ্ধে বিভবত্যেব আত্মা'।
ক (১।২।২০—'তমক্রতুঃ ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ'।
মু (৩।১।৯)—'……প্রাপৈশ্চিত্তং……বিশুদ্ধে বিভবত্যেব আত্মা';
শ. বি.—(১১৯)—'বিশুদ্ধসত্ত্বস্য…… স্বাত্মানুভূতিঃ (৩৮৩)—'বিশুদ্ধমনঃকরণং …ততঃ'।
ঈ (৫)—' …তত্ত্বজ্ঞস্য সর্বস্য…… বাক্ততঃ'
শ. বি. (৫৬)—' ব্রহ্মাত্মৈক্যস্য বোধেন মোক্ষঃ সিদ্ধতি……'।
২৪ক। ছা (৬।৮।৭ ; ৬।৯।৪ ৬।১৩।৩)।
২৬। শ. বি. (২৬-২৮)—"সর্বদা …স্মরতে সকলম্"।

মাতৃকৃপায় মুক্তিতীর্থ অমরনাথ

শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে নানাকথা ভাবছি। এমন সময় নীল গঙ্গায় প্রদীপ ভাসছে দেখে একটু এগিয়ে গেলাম। ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে গঙ্গার বুকে প্রদীপগুলোকে যেন অনেক বেশী স্বচ্ছ লাগছে। তীরের কাছাকাছি যেতে নদীর চলার শব্দও যেন স্পষ্টতর বোধ হোলো। ১০।১২ গজ দূর থেকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল যে একজন নীল গঙ্গার উত্তর পারে বোসে একের পর এক প্রদীপ ভাসিয়ে চলেছেন। আর আমি যেন তাঁরই নীরব আকর্ষণে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি একান্তভাবে—শূন্য মনে। ৪।৫ হাতের যখন ব্যবধান তখন আমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে নীল গঙ্গার দিকে দৃষ্টি রেখেই বীর কণ্ঠে আহ্বান জানালেন—"এসো বোসো।"

প্রত্যেক প্রদীপ ভাসাবার আগে পরাশক্তির স্তোত্র মধুর কণ্ঠে উচ্চারণ কোরে তবেই ভাসাচ্ছেন। প্রদীপগুলো ঘুরে ঘুরে স্রোতের সাথে, তালে তাল মিলিয়ে চলেছে, একের পর এক। পরিবেশ শান্ত। প্রদীপের আলোতে যেন মনের কালো অনেকটা দূরীভূত হোয়ে গেলেছে। মোট এগারটা প্রদীপ একের পর এক ভাসালেন। সর্বশেষ প্রদীপটি ভাসাবার আগে সুমধুর কণ্ঠে শিবস্তোত্র পাঠ কোরলেন—

ত্রিকাগ্নিকালনলায় মনোন্মনায় ত্রিয়ম্বকায় ত্রিপুরান্তকায়।
কালাগ্নিরুদ্রায় জগন্ময়ায় শিবায়দেবায় নমঃ শিবায়॥
রাজসেন স্বয়ং ব্রহ্মা-সাত্ত্বিকেন স্বয়ং হরি।
তামসেন স্বয়ং রুদ্রস্ত্রিগুণং ত্বয়ি সংস্থিতম্॥
নমামি ত্বাং বিরূপাক্ষ নীলগ্রীব নমোঽস্তুতে॥

বিশুদ্ধ বাংলায় প্রার্থনা জানালেন জগৎপিতাকে :—

"হে আশুতোষ! হে মহেশ্বর! তুমি আমাকে যেমন ভক্তি দিয়েছ, আমি সেই ভক্তি দিয়েই তো তোমার আরাধনায় সমর্থ! আমাকে তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও প্রভু। মলিন বোলে, অপরাধী বোলে, আমাকে

ত্যাগ কোরো না। গ্রহণের অযোগ্য হলেও—হে অধমতারণ! হে পতিতপাবন! আমি তো তোমারই। তোমার সর্বাশ্রয় শ্রীচরণে আমাকেও আশ্রয় দান করো। কৃপা করো—কৃপাময়। জগতের মঙ্গল করো—মঙ্গলময়। অথও মঙ্গল বিধান করো—প্রভু।"

প্রদীপের আলোতে এবারে ভাল কোরে দর্শনের সুযোগ পেলাম। সৌম্য, শান্ত এবং নির্বিকার ভাব। বয়স প্রায় ৬ ফুট। সুদর্শন, সুঠাম দেহ। গলায় ঝকঝকে উপবীত। মাথায় চুল ঘাড় পর্যন্ত। দাড়ি ছোট কোরে ছাঁটা। আজ্ঞাচক্রে একটা বড়ো শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। দেহ মাত্র একখানা সাদা চাদরে ঢাকা। পায়ে কাঠের পাদুকা। কাঁধে একটি ছোট ঝোলা। দেখলেই ভক্তি যেন আপনি আসে। মুখমণ্ডল পবিত্র তেজে দীপ্ত। ভক্তিভরে প্রণাম কোরলাম। চরণযুগল নীল সলিলে বরফ গলা জলের ভিতরে থাকায় হিমশীতল।

শান্তভাবে প্রশ্ন কোরলেন—"তীর্থে যাচ্ছ? তীর্থের অর্থ জান?" কি জবাব দেব ভাবছি। মনে আমারও অনেক প্রশ্ন।

(১) কে ইনি? দেখে সাধু মনে হয়। এই শীতে দেহ প্রায় অনাবৃত। মুখমণ্ডলে বেশ একটা প্রশান্তি এবং আনন্দের ছাপ। বাঙালী দেহ। যুক্ত পুরুষ। কিন্তু সৈরিক বসন দেহের কোথাও নেই। গলায় বা হাতে নেই কোন জপের মালা। অঙ্গে নেই কোন রকম ভিন্নক চিহ্ন অর্থাৎ বেশগত ভাবে সাধু সমাজের সাধারণ বহিরঙ্গ বিবর্জিত।

(২) আবার মনে হোলো, সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী কি আপন পরমার্থ লাভের বেলায়—পরিজনবর্গের মর্মবেদনার কারণে—স্বার্থান্বেষী নন?

(৩) শুনেছি জীবজগতের, বিশেষ করে মানব সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ কামনাই এঁদের প্রধান কাম্য। কিন্তু বাহ্যিক দিকে এঁরা কিভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করেন জানিনা বা বুঝিও না। যাঁরা ক্ষুদ্র সংসারে থেকে আপন আপন আত্মীয় স্বজনের সেবায় অক্ষম তাঁরা কেমন কোরে বৃহত্তর সমাজের সেবক হোতে সক্ষম হবেন?

আমাকে নীরব দেখে আবার প্রশ্ন—"কি ভাবছ? আমি সাধু কি অসাধু? আমার পরিচয় কি? সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ কোরে স্বার্থান্বেষী কি না—এই তো?

শোন বলছি। আমি সাধু নই। কারণ আমার বিশুদ্ধ মনের পূর্ণ স্বাদ এখনও আমি গ্রহণে সক্ষম হোতে পারি নি। আর সাধকও নই। তার কারণ যাঁর শুধুমাত্র "একে" স্বাদ নেবার স্পৃহা, তিনিই সাধক। আমার এখনও বহুতে স্বাদ গ্রহণের বাসনা বর্তমান। বহুতে "একের" স্বাদ গ্রহণেও আমি পূর্ণ অক্ষম। শ্রীগুরুই জানেন—কোনদিন সক্ষম হবো কি না।

তবে এই দেবাত্মা হিমালয়ে বহু ধ্যানমগ্ন সাধু এবং সন্ন্যাসী আছেন যাঁদের সত্য চিন্তাধারার পবিত্র কম্পনে মানব হৃদয়ে এখনও সত্য উপলব্ধির বীজ জাগ্রত আছে। তা না হোলে সমাজের সত্য একান্তভাবে লুপ্ত হোয়ে যেতো।

জান তো—রেডিও ষ্টেশনের ধ্বনিতে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আর ঘরে ঘরে, রেডিওতে সেই ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত রূপে হয় প্রচারিত। গ্রাহক যন্ত্র অর্থাৎ বাড়ীর রেডিও সেট যদি ভাল না হয় তবে ঐ প্রতিধ্বনি ঠিক ঠিক ভাবে ধরা যায় না। ঠিক সেই ভাবেই ঐ গুহাকন্দরে ধ্যানমগ্ন সাধু সন্তরা প্রত্যেকে এক একটি সুবিশাল রেডিও ষ্টেশনের কেন্দ্রস্বরূপ। মঙ্গল অনুষ্ঠানের প্রেরক যন্ত্র। ঐ সকল পবিত্র দেহ যন্ত্র থেকে সত্য উপলব্ধির কম্পন বায়ু-মণ্ডলে অবিরাম প্রচারিত হোয়ে চলেছে। আর মানুষের দেহ যন্ত্রের পরমাণুগত যোগ্যতা অনুসারে ঐ মঙ্গলময় কম্পন বোধে ধরা পড়ে। সাধারণে মনে করে যে ঐ সৎচিন্তাধারা তাদের আপন আপন হৃদয়েরই সংবেদন মাত্র। কিন্তু আসলে তা নয়। সত্যদর্শী এবং স্বসংবেদনশীল যোগী মহাত্মাদের মহানভাবধারার কম্পনের ঢেউ।

আর একটা কথা। সংসার ত্যাগেই সাধু হয় না। ত্যাগের সাথে গ্রহণ গ্রথিত। তোমার ত্যাগ তোমার সংসারের গ্রহণ করা চাই। অর্থাৎ তোমার ত্যাগে তোমার সংসারের অনুমতি থাকা চাই। তুমি ছাড়লেই ছাড়া পাবে না। সংসারেরও তোমাকে ছাড়া চাই। তা না হোলে

সংসার তোমার পিছনেই ছুটবে। কখনও ধরে না।

আমার ধারণা আমি সংসার ত্যাগ করি নি। সংসারই আমাকে ত্যাগ কোরেছে। আর তা ছাড়া কোন কিছু ত্যাগ করার মালিকও আমি নই। ঐরকম ত্যাগের ইচ্ছারও প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার থাকে। যদিও পূর্বাশ্রমের কথা চিন্তা করা বা তাবোও এখন আর আমার উচিৎ নয় তবুও তোমাকে বলতে পারি। কারণ তুমি আমার আত্মার আত্মীয়। তবে তুমি তা জান না।

যাক্ বলি শোন। আমার এ দেহ বাংলার। পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলায়, কোটালিপাড়া গ্রামে ১৮৮৮ সালে আমার জন্ম। ১৯০৯ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার পরে মায়ের ইচ্ছায় আমি বিয়ে করতে বাধ্য হোলাম। ১২ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। সংসারে আমিই মায়ের একমাত্র অবলম্বন। আর্থিক দিকে আমাদের কোন অভাব ছিল না। তার উপরে আমার লেখাপড়ার কোন খরচও ছিল না। কারণ ছাত্রজীবনে আমার স্কলারশিপ ছিল। জলপানির টাকাতেই সব খরচ চলতো।

আমি রয়েল ইণ্ডিয়া মিলিটারী সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলাম। ১৯১০ সালে মিলিটারী সার্ভিসের একটা বিশেষ ট্রেনিংয়ে ইয়োরোপে যেতে হোলো। দু'বছর পরে মাতৃভূমিতে ফিরে এলাম পোর্টিং লেলাম কলকাতায়। আমার একটি কন্যাও হয়েছিল।

১৯১৪ সালে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো পৃথিবীর বুকে। অনেকের সাথে আমারও ডাক পড়ল যুদ্ধক্ষেত্রে। যদ্ধ প্রায়ো বেশ কিছুদিন ছিলাম। কাজ প্রচুর।

ইঞ্জিনীয়ারিং ব্রাঞ্চিসে তখন প্রচুর পয়সা। ঐ সময় কিন্তু আমার গর্ভধারিণী মায়ের সমস্তগুলি পূজা এবং নাম জপেই কেটে যেতো। সংসারে মা একান্তভাবেই নির্লিপ্ত ছিলেন। আমরা সকলেই মহাশক্তিধর গুরু ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণরাম পরমহংসদেবের শ্রীচরণে আশ্রিত। গুরুকৃপায় মা বিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতিও লাভ করেছিলেন। কোলকাতায় এলে মা মাঝে মাঝে বলতেন, "খোকা, প্রয়োজনের বেশী সম্পদ থাকা ভাল নয়। আমাদের আর টাকা পয়সার দরকার কি? শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে একটু লক্ষ্য রেখে পথ চলো। সততাই মানুষের পরম আশ্রয়। শ্রীগুরুর কৃপা দৃষ্টি সদাই জাগ্রত। সে দৃষ্টি এড়ানো অসম্ভব। জীবনে যে ভাবধারায়, যে পথেই চলো না কেন, সময় হোলে তিনি তোমাকে শোধন করেই চৈতন্য দান করবেন। তবে দহন ছাড়া শোধন হয় না। সে দহন জ্বালা সহনের যোগ্যতা যেন তোমার থাকে—এই টুকুই আমার প্রার্থনা।"

(ক্রমশঃ)

শোকবার্ত্তা

অমূল্য লাহিড়ী গত আগষ্ট মাসে ইহলোকে প্রয়াণ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বৎসর। তিনি রেখে গেছেন পাঁচটী কৃতী পুত্র ও একটী কন্যাকে। তিনি ছিলেন মানবদরদী এবং শিক্ষানুরাগী। তাই আত্মীয় স্বজন ছাড়াও অনাত্মীয় বহু গরীব দুঃস্থদের পড়াশুনার সাহায্যার্থে প্রচুর অর্থব্যয় করতেন। এগুলো গোপন দান হিসাবেই তিনি দিতেন। রাজশাহী থেকে কলকাতা চলে এলেন দেশ বিভাগের ঠিক পরেই। এখানে এসে ভগবৎকৃপায় শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের সান্নিধ্যলাভ করলেন। শীঘ্রই তাঁকে গুরুরূপে বরণ করলেন এবং দীক্ষালাভে ধন্য হলেন। শ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। আর তেমনি ছিল শ্রীঠাকুরেরও তাঁর এই শিষ্যের প্রতি অফুরান স্নেহ। নিয়মিত ভোগের উপচার ও ফুল ইত্যাদি নিয়ে আসতেন ঠাকুর সদনে এবং এসেই সাষ্টাঙ্গে বিধিবৎ প্রণিপাত করতেন। ঠাকুর ওঁর অকৃত্রিম ভক্তি নিবেদনে তৃপ্ত হতেন এবং প্রভূত আশীর্ব্বাদ করতেন। সেই আশীর্ব্বাদ ও কৃপার অনন্ত পাথেয় নিয়ে অমূল্য লাহিড়ী সজ্ঞানে ইহলোকে চলে গেলেন। তাঁর আত্মার অক্ষয় শান্তি একান্ত কামনা করি।

সবার পিছে সবার নীচে—অমলকুমার সেন : মূল্য ছ' টাকা।

প্রকাশক : শান্তিরঞ্জন দাস, আনন্দভবন, ১৮ আনন্দপুর, কলিকাতা-৫৬

"সবার পিছে সবার নীচে" গ্রন্থটি লেখকের ২০টি প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রবন্ধগুলি "ভূমিলক্ষ্মী" "সর্বোদয়" "ভাবমুখে" "অগ্রণু" ইত্যাদি পশ্চিমবাংলার নানা পত্র পত্রিকায় বর্তমান দশকের মধ্যে প্রকাশিত। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধগুলি পর পর পড়ে গেলে মনে হয় না আলাদা আলাদা প্রবন্ধ পাঠ হচ্ছে। মনে হয় আগাগোড়া একটি প্রবন্ধ—একটিই তাঁর Theme, একটিই তার সুর—সেটা হচ্ছে লেখক গোড়াতেই যে-কথা "নিবেদন" করেছেন—"সবচেয়ে নীচের মানুষটিকে সবচেয়ে আগে মর্যাদা দিয়ে গ্রামভিত্তিক ভারত গড়ার নতুন অঙ্গীকার।"

এ-প্রসঙ্গে প্রবন্ধগুলির আলোচনার মূল কথা হচ্ছে—সাত লক্ষ গ্রামময় ভারত মূলতঃ কৃষি প্রধান দেশ। ভারতের অর্থনীতিও কৃষিনির্ভর। এ দেশের দারিদ্র্য তথা পশ্চিমী হটাবার অব্যর্থ হাতিয়ার রয়েছে গ্রামেরই পথে। গ্রামের গরীব বা বেকারের উদরান্নের মধ্যেই রয়েছে গোটা ভারতের স্বাস্থ্য ও সুস্থ রাজনীতি ও অর্থনীতির চাবি-কাঠি। কারণ দেশের মূল উৎপাদন শক্তি গ্রামের মাটিতে, গ্রামের কৃষক মজুরের হাতে। সুতরাং ভারতের সার্বিক কল্যাণ সাধন গ্রাম ভারতের কৃষি শ্রমিক সাধারণ মানুষের উন্নতি ভিন্ন অসম্ভব। এ কথা চিন্তা করেই জাতির জনক গান্ধীজী বলেছিলেন—"ভারতের গ্রাম না বাঁচলে ভারত বাঁচবে না, জগতে ভারতের যে ব্রত রয়েছে তা লুপ্ত হয়ে যাবে।" লেখক বলছেন,—"ধন নয়, মান নয়, দরকার হাতিয়ার নয়—সহজ সরল জীবনে বাঁচবার এবং বাকি সবার জীবনকে বাঁচাবার জন্য নিজে মরবার, নিজের জীবনকে বলিদান করবার ব্রতই শত শতাব্দী ধরে ভারতকে বাঁচিয়ে রেখেছে।" জগতও ভারতের কাছে এই ব্রতই পেয়ে এসেছে এবং প্রত্যাশা করছে আজও। জগতের প্রতি ভারতের এই ব্রত সম্পাদন গান্ধীজী বলেছেন, যে কোন স্বাধীন ভারতের দ্বারা সম্ভব হবে না, বলিষ্ঠ গ্রামময় ভারতেরই শুধু সে যোগ্যতা থাকবে। (পৃষ্ঠা, ২-৩) গান্ধীজীর সেই নতুন ভারত গড়ার কাজে দেশ ও জাতি কতদূর সফল হতে পেরেছে তারই হিসেব নিকেষ খতিয়ে দেখাই স্বনামধন্য সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্রীঅমলকুমার সেনের এই "সবার পিছে সবার নীচে" প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের মূল কথা।

প্রবন্ধগুলিতে লেখক দেখিয়েছেন ৩০ বছরেরও ওপর স্বাধীনতা ভোগ করার পরও, ভারতের উন্নয়ন করে রাশিয়ার অনুকরণে কয়েক দফা বড় বড় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত কেন গড়ে তোলা সম্ভব হল না। ব্যর্থতার মূল কারণ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন ভারতের সংবিধানে ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশের সাধারণ মানুষ, যার শতকরা ৮০ জনই গ্রামবাসী, সেই গ্রামীন মানুষের উন্নয়ন চিন্তা তেমন প্রাধান্য না পাওয়া। ফলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দেশের যারা "সবার পিছে সবার নীচে" তাদের অবস্থা আজ শোচনীয়। এই নীচের তলার মানুষ যাদের অধিকাংশ ভূমিহীন চাষী, ভূমিদাস, কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুর তাদের দীন জীবনযাত্রার রূপচিত্রটি লেখক তাঁর দরদী মন নিয়ে প্রামাণিক পরিসংখ্যান তথ্য সহায়ে অতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে গান্ধীজীর স্বদেশ ভাবনা ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সুর

দিনিয়ে বলেছেন—"এই গ্রামপ্রধান ভারতে কৃষি ও কৃষক নির্ভর দেশে নীচুতলাকে উপেক্ষা করে বা গৌণ করে ছাদ শক্ত করার চিন্তাও পাগলামি। মাটি ও শিকড়ের স্পর্শটুকু যার হয়নি সে যদি চাঁদ ধরতে হাত বাড়ায়, আকাশে উঁচু দিয়ার যদি হয় তার স্বপ্ন, তার না থাকে পায়ের তলায় মাটি, না থাকে মাথার উপরে আকাশ। একত্রিশ বছরের স্বাধীনতা ও সাতাশ বছরের পরিকল্পিত উন্নয়নের পরে আমাদের কাল হচ্ছে ঠিক তাই। আজও দেশের শতকরা অন্তত ৫০টি মানুষের পেটে এক বেলা অন্ন পড়ে না।" (পৃঃ ১১০) "বেশীর ভাগ মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও এক বেলা পেট ভরে খেতে পারে না আর কিছু মানুষ তাদের এই প্রাণান্তকর শ্রমের ওপর আয়েসের কুর্শি চাপিয়ে হেলে হেড়ে খাবে, দারিদ্র্যের মূলেই রয়েছে এই অসহনীয় শোষণ ও বৈষম্য। (পৃঃ ১১১)

এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সহরে মেহনতী মানুষের তবু কিছু সংঘবদ্ধ আন্দোলন আছে, কিন্তু গ্রামের মানুষের মধ্যে তেমন সুসংগঠিত আন্দোলন নেই। এমন কি লোক সভাতেও "গ্রামের মুখপাত্র আছে, মুখ নেই। গ্রামের লোক আছে, স্বাধীন লোক নেই। গ্রামের মাতব্বরটি পায়ে মাপা মুষ্টিমেয় দাঁড়ি আছেন বটে তাঁরা একেবারে সহজ সরল পল্লীবাসী, রাজধানীর দরবারে মুখ খুলতেই তাঁদের ভয়, নয় তো নগরবাসী বুদ্ধিমান সদস্যদের চাপে তাঁরা বোবা।" (পৃঃ ৬৩)

প্রসঙ্গতঃ "পরিকল্পনায় মানুষের কল্পনা নেই" প্রবন্ধে লেখক আরও একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—"আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বস্তু সম্পদ চেয়েছে, মানুষ চায়নি। অন্ত্যোদয়ের হিসেব করেছে, গান্ধীজীর ভাষায় 'আধ্যাত্মিক জীবনে উপবাসী' কোটিকোটি মানুষের কোন হিসেবই করে নি। কে করবে?" "মানুষই মানুষের উন্নতির পথ-গুলোকে প্রশস্ত ও ফলপ্রসূ করতে পারে। কিন্তু চারদিকে, কাজের উচ্চনিনাদের মধ্যে, খুঁজে পাওয়া যায় কি তাদের? পরিচয় পাওয়া যায় কি মানুষের?" ভারতের উন্নয়ন পরি-কল্পনায় মানুষ গড়ার শিক্ষার পরিকল্পনা নেই বলেই আমলা-তান্ত্রিক প্রশাসকদের প্রণীত ও পরিচালিত পাঁচশালা পরি-কল্পনাগুলির গুণগত সাফল্য আজও সুদূরই থেকে গেল। দেশ সমৃদ্ধির দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারলই না, সাধারণ মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল।

দেশের এই ভয়াবহ অবস্থায় মোক্ষবিলায় পথও লেখক গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও বিনোবাভাবের দেশ ও বিশ্বাত্মক সর্বোদয় আন্দোলনের ভাবাদর্শের আলোয় দেখিয়েছেন। বলেছেন, শুধু ভূমি-বণ্টন বা ভূমিসংস্কার হলেই হবে না, ক্ষমতারও বণ্টন চাই—সর্বাধিক মর্যাদা, প্রশাসনের সর্বাধিক প্রত্যক্ষ ক্ষমতা গ্রাম বা গ্রামসমাজের হাতে সংগঠিত করতে হবে। সেজন্য সংবিধানের সংশোধন ও উপযুক্ত গণপরিষদ চাই। সর্বোপরি চাই মানুষ—অর্থাৎ মানুষ গড়ার শিক্ষা।

গান্ধীজীর সর্বোদয়ের ভাবরূপকে বাস্তবায়িত করতেই বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞের আরম্ভ হয়। বিনোবাজীর ভূদানযজ্ঞ বিষয়ে লেখকের আলোচনাগুলি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। ভূদান সম্পর্কে সাধারণের ধারণা কুয়াশাচ্ছন্ন। সেই কুয়াশার জাল লেখক সরিয়েছেন। ভূদানযজ্ঞের গভীর তাৎপর্যটি তাঁর সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। কৃষি-প্রধান গ্রাম ভারতের উন্নতি ভূমিসংস্কার ভিন্ন যে সম্ভব নয় আজ দল মত নির্বিশেষে সকলেই সেকথা উপলব্ধি করতে পারছেন। সরকারকেও এজন্য সিলিং এ্যাক্ট প্রবর্তন করতে হয়েছে। আইন করেও উদ্দেশ্য কিন্তু চরিতার্থ হয়নি। অথচ বিনোবাজী চেয়েছিলেন, সঙ্গীন্ উঁচিয়ে বা আইনের জোরে নয়, মানুষের স্বাভাবিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে এক সর্বাঙ্গীন সমাজ বিপ্লব নীরবে সাধন করতে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে সে মহতী প্রচেষ্টাও সফল হতে পারল না—এটাই দেশের দুর্ভাগ্য।

লেখকের যুক্তি অকাট্য, ভাষা সহজ সরল ও বলিষ্ঠ। প্রত্যেক প্রবন্ধে গঠনভিত্তিক মৌলিক চিন্তা ও গভীর মনন-শীলতার ছাপ সুস্পষ্ট। "সবার পিছে সবার নীচে"র মানুষের জন্য লেখকের গভীর দরদ ও মমত্ববোধ এবং

কল্যাণ ধর্মী উদার দৃষ্টিভঙ্গী পাঠকের অন্তর স্পর্শ করবেই।

'এলবার্ট শোয়াইৎজার', 'সুভাষচন্দ্র ও সমাজবাদ', 'কবি ও কর্মী', 'আমেরিকায় বেদান্ত যা দেখেছি যা পেয়েছি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি একটু ভিন্ন সুরের হলেও "সবার পিছে সবার নীচে"র মানুষটীর ভাবনা, এগুলিতেও স্থান পাওয়ায় এ গ্রন্থে এদের অন্তর্ভুক্তি অযৌক্তিক না হয়ে বরং অতিরিক্ত আকর্ষণ সৃষ্টি করতেই সাহায্য করেছে। গ্রন্থে একটী সূচীপত্রের অভাব আশা করি লেখক দ্বিতীয় সংস্করণে পূরণ করবেন।

—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

সুস্নিগ্ধ শেফালি

শ্রীঅর্চ্চনাপুরী

অনাসক্ত শেফালির ঝরে পড়াটুকু
　　তুলে নেব সুন্দরের সাধন সংগীতে
জীবনের প্রতি তীর্থে প্রতি অর্ঘ্য সাথে
　　একটি সুনম্র প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি দিতে।
রাত্রি আর প্রভাতের পবিত্র বিস্তার
　　একটী আনন্দ মধু সুরভির মত
সপ্ত সাগরের বারি করুক সিঞ্চন
　　ঘুচে যিক পূজাহীন বেদনার ক্ষত।
আসক্তির বৃন্ত টুটে ঐ যে শেফালি
　　ক্ষণিকের সুরভিকে করেছে বরণ
অবিশ্বাস মহিমায় ধরেছে উজ্জ্বল
　　মাটীর গভীরে ঐ তৃপ্ত নিবেদন।
আলোর চুম্বন এসে যায়নিকো ফিরে
　　ঘিরে গেছে ও রঙ তারে স্নিগ্ধ স্বাক্ষর
নিভৃত ধৈর্য্যের মত ঐ যে সাধনা
　　অযুত সোনার হাতে ছুঁয়েছে অন্তর।
আমি চাই হ'তে ওর অতিরিক্ত প্রাণ
　　অচল প্রতিমাবক্ষে জাগাতে নিঃশ্বাস
বাসনার অন্ধকারে যায় না যা শোনা
　　শুনেছ তা শেফালির সুস্নিগ্ধ বিশ্বাস।

* কবিতাটির শ্রীযোগেশনাথ মল্লিক কৃত ইংরেজী অনুবাদ এই সংখ্যার ইংরেজী বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে

দুঃখ রাতের বন্ধু

শান্তশীল দাশ

দুখের দিনে যাবে যখন গভীর অন্ধকার
হাতটি বাড়াই পাব বলে বন্ধুকে আমার।
　　ভাবি যারের আপন বলে,
　　সবাই তারা যায় যে চলে ;
একলা ঘরে অবরুদ্ধারে ঝরে নয়নধার।
চোখের জলের পথে তুমি আস' আপনজন,
প্রশান্ত মুখ, দু'হাত ধরে বোঝাও দু'জন।
　　সকল আঁধার যায় যে সরে,
　　ভুবন আমার আলোয় ভরে।
দুঃখরাতের বন্ধু আমার, তোমায় নমস্কার!

WORLD PSYCHOLOGY

Sreemat Swami Satyananda Deva

[Swami Bimalananda, an M.A. in Philosophy and Education and a disciple of Sree Sree Thakur Satyananda Deva, completed Parts V & VI under the guidance and direction of his holy preceptor.]

ANIMAL PSYCHOLOGY (contd.)

Behaviour and the Nervous System

The old problem of the 'brain-behaviour' or rather the relationship between the structure and function of the nervous system and the organisation of behaviour is a subject of interest to all. The solution has proved difficult, yet, this is being studied more and more.

The comparative anatomy studies the changes in the structure of the nervous system that come with evolutionary developments and the neuro-physiologists have tried to define the structure-function relationships while the comparative psychologists are trying to derive basic behavioural principles co-ordinate with these fundamental biological principles.

A general pattern is clearly exhibited in both phylogeny, i.e. the evolution of organisms and ontogeny, i.e. maturation. Variety, fineness and complexity of behaviour increase in close correspondence to the growing centralisation and encephalization of the nervous system. The development of biological forms follow the general principle of differentiation and centralisation. The nervous system progressively differentiates into more specialised tissues and their organisation grows from a diffuse system to a centralised and integrated structure. It may be seen in the maturation of the individual as well as in the evolution of organisms.

In invertebrates, in the primitive coral forms, the nervous system is undifferentiated and noncentralised. The reaction and response to environment is an undifferantiated contraction of the whole organism. In the next stage, as in Jelly fish, differentiation and centralisation begin to appear as require in free swimming. The spiny skinned animals, the starfish, etc. exhibit a greater differential sensitivity. A significant development is found in higher invertebrates, such as earthworms.

The vertebrates show more structural and functionl unity with important implications for neural behavioural relationships. The most important development is at the rostral or head end of the organism. Sense organs also develop. The evolution of sensory and motors systems provides with refind sensitivity and control.

As evolution continues, the development of the brain is characterised by ever-increasing growth, complexity and control over the lower centers. This principle is called encephalization.

This general evolutionary (phylogenetic) and maturational (ontogenetic) patterns gradually show the tendency of the organism to adapt the environment to its own use as against the primitive adaptation of the organism to the environment. So a comparative approach is valuable and necessary.

Techniques :

The techniques of investigating neural participation in behavioural events are i) the microscopic analysis, ii) artificial stimulation of the nervous system, iii) electrical recording and iv) ablation. In spite of many problems involved, the general outlines of some basic neural behavioural relationships can be found out in the studies concerned with sensory processes, motor patterns, motivational factors, learned behaviour, emotional patterns etc.

"Sweet Calm Shefali"

[*English rendering of* **Sree Archanapuri's** *Bengali* **"Susnigdha Shefali"** *by* **Sri Jyotsna Nath Mallik**]

The soft shedding of unconcerned Shefali,
in devotional songs of the beautiful I shall store.
at each holy place of life, with each offering,
a flower offering of gentlest love to pour.

The holy expanse of night and dawn,
like a moment immersed in joy,
may sprinkle the waters of seven seas,
wounds of irreverent agony to destroy.

That Shefali there shed from attachment stem,
has chosen the fragrance of a moment,
oscillation
in unforgettable glory grows resplendent.

The sandal paste of light returns not in vain,
on its forehead too leaves creations signature mark

I aspire to be its initiated clan,
in the heart of immobile image to instil breath,
that is not heard in darkness of desires
but is heard by Shefali's sweet calm faith.

*Original Bengali is in the Bengali Section of this issue.

Many people seek God only after disappointment in other spheres. But one who from childhood can place one's heart at the Master's feet like a fresh flower is blessed indeed.

—Sri Sarada Ma

Constant Experimentation—A Suicidal Policy In Education

Principal K. C. Karmakar

Education does not live in a vacuum. On the other hand, it is woven into the very texture of our life and society. Its principles should, therefore, be based on the hard rock of reality so that the nation may safely rely upon them for its guidance in the right direction. Indeed a flexible policy is doomed to failure, unable to bear the brunt of reality, the storm and stress of life, where as a stable educational policy, judiciously chalked out, proves to be most effective in steering the course of the national life, in the teeth of all untoward circumstances.

It is regrettable that our educational planning has hardly proved equal to the situations that have cropped up in the post-independence era of our education. It appears to have been erratic, subject to flexibilty passivity and stagnation. It is, as it were, our learned planners in their soaring ambition to usher in the covetable re-orientation in the sphere of education, have been misled to an ivory tower from which they looked upon reality through the coloured glasses of an indolent fancy. The mirage of a deceitful education with its alluring dreams, seems to have exercised a spell upon their minds, and they might have sought to recapture the vision in different ways, through the various channels of the Education Commissions culminating in that momentous 'historical document' as embodied in the Kothari Commission Report. 'Although buttressed with an array of statistices,' the said report has obviously gone out of accord with the realities of the situation. It is painful to record that many projects and recommendations, apparently hailed as most timely and indispensable, have eventually been put into cold storage to add to the sense of uncertainty about our educational prospects and to the aching sensation of frustration that has already gripped our national consciousness.

It is in the above context that an all-pervasive craze for experimentation has occupied our stalwarts. In fact, there is ample scope for this, because it helps much in the discovery of truth and in reaching the scientific goals or objectives. But it is necessary that all educational experiments just as their counterparts in other spheres, should be conducted very carefully and intelligently, so as to integrate our educational planninig with the general development project of the country. And any rash or careless experiments on such a vital issue will certainly spell a disaster on our national life and will stand in the way of our educational march in any right direction. Hence it is essential that a broad consensus of informed opinion should be taken before proceeding in the arena of any reform or reconstruction in the country's education.

No drastic change in the patsern of our education is, therefore, desirable, as it affects the normal atmosphere of education and creates fresh problems for the educators

and the educands alike. In this connection, a reference may be made to the earlier measures of the Govt. for structural changes in education. For example, the Board's erst while departure from the Higher Secondary Scheme to a X class pattern, followed by the West Bengal Council's +2 system in quick succession, has brought in its train no tangible good to the country. On the other hand, much confusion has sprung therefrom, as is easily intelligible to all concerned. In fact, hasty and frequent experiments should hardly be entertained in the general interest of education. Experimentation with the pupils should not be so frequent and abrupt, but a decisive policy bearing the stamp of fersight, restraint and deeper understanding should be adopted so that the devastations of a structural earthquake in the name of educational regeneration, may be averted in no time for the defence of our education.

As regards the puplic examinations, there is little scope for changing the system, prevailing at present. In other words, the public examination that is held at the conclusion of the class-X course i.e. the Madhyamik Pariksha should not be subjected to an abrupt end, but should be allowed to continue *pari passu* with the Council's H.S. Exam. at the end of the XII-class course. If this system is maintained, the reaction caused to all concerned in the wake of the inception of the +2 course, will, no doubt, be minimised and they will be saved from the panic of any fresh change in the field of the examination.

On the other hand, it is heard that a change in the above set-up is in the offing. It is anticipated that the Board's Madhyamik Examination will be studiously kept out and provision will be made for the following two public examinations—one at the end of the class-VIII course (Junior) and the other at the end of the +2 Course (H.S.). It means that there will be a gap of continuous four years in between the Junior stage and Higher Secondary level, and this gap will certainly be visited by fresh havocs, in different spheres, obstructing the educational march of the country.

The abolition of the Madhyamik Pariksha will prove a varitable curse to the poor students of the state. Most of them will fail to prosecute their studies upto the H.S level beyond the Junior stage. In case they get themselves admitted to class-IX they may be compelled to discontinue their studies owing to poverty before reaching the H.S. level. As a result, they will fail to obtain the Certificate qualifying them for securing any job. Moreover, this will cry a halt to the advancement of our education and it is apprehended that the darkness of illiteracy will deepen further

As ragards the proposed public examination at the Junior stage, the change will hardly be welcome to the students of class-VIII standard. Their immature minds will react to this rather adversely, and the normal growth of their budding minds will presumably suffer a set-back if the change occurs abruptly. Hence it is advisable that a 'status Quo' should be maintained so far as the question of the examination reform is concerned.

The idea of changing the examination-pattern in the clumsy atmosphere created under the West Bengal Council's new pattern of education can hardly be entertained, taking in view the general trend towards the abolition of the public examination and

the introduction of a new system of teacher controlled examination.

In fine, the present writer would appeal to the stalwarts in the educational sphere to give up their craze for constant experimentation in education so far as its technical aspects are concerned. It will be better if they concentrate more on the spiritual aspects of the issue, seeking to revive the out moded values so as herald the possibility of a higher order of life and society. It is desirable that a concerted effort should be made to harmonise the technical aspects of education with their spiritual counterparts, and hence the supreme necessity of resorting to the manmaking device of Swami Vivekanada and integrating the modern technological and scientific advancement with a corresponding measure of spiritual development in man.

Veda–Chhanda (Part III) Sri Thakur

[*Translated by* **Sri S. N. Sanyal**]

87. Is love so easy ! Love is death. Love will only come when every thing else will leave the mind. Thakur has said, the consciousness of the body will be forgotten.

88. Thakur is now engaged in Lila and thus desires that His creation may be unfolded. Again when He will withdraw the creation within Himself, desire no further expansion and be calm, the destruction will come on that day. All the disputes will then be resolved. Thus there are so many complications in creation and we are also moving downwards.

89. As there are germs of diseases, so there are germs of diseases of mind.

90. Try to keep your mind engrossed in lofty ideals. Every day think at least once about Ramkrishnaloka. Even if there be no such realisation think at least once every day that Thakur is in every being. This will yield tremendous result.

91. Mahapurushas, even if they have powet so to do, do not act in such a way that following them people may bring social revolution People will follow their conduct. So they do not act improperly, not even mentally. As to a knower of Brahman truth and falsehood are the same, but they do not act falsely so that people may not follow the same. The conduct of Mahapurushas is always and every where conducive to good, for the welfare and the happiness of the many.

92. Every thing, knowledge, devotion, discrimination and renunciation, may be had by rolling on the dust of Dakshineswar. Here Thakur has practised death-defying Sadhana in every way.

93. Fineries come from fineness, from grossness comes grossness.

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by :—

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA - 22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (5 Lines)

FOR

COMPLETE WORKS

OF

Swami Satyananda

In Eight Volumes

Price : Rs. 120·00

Please contact Phone : 52-7133

SREE RAMKRISHNA SEVAYATAN

2, P. K. SAHA LANE,

CALCUTTA-700030

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ১নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩০ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ ১ বিশ্বনাথ দত্ত লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ফোন : ৩৫-১৬৮১। মুদ্রাকর ও প্রকাশক-স্বামী ঊনত্রিংশ

প্রচ্ছদ পরিচিতি : "Age of Innocence" চিত্রটি রিনল্ডসের তৈরী গ্যালারিতে রক্ষিত। এই ছবিখানি স্যার জোশুয়া রেনল্ডসের অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির মধ্যে একটি এবং এইটিই তাঁর শেষ চিত্র। ইনি বিবাহিত ছিলেন না। শিশুদের চিত্র তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ শিল্প নৈপুণ্যে প্রকাশিত।

Regd. No. W B/RC-34

52-/133

In the Service of the Nation

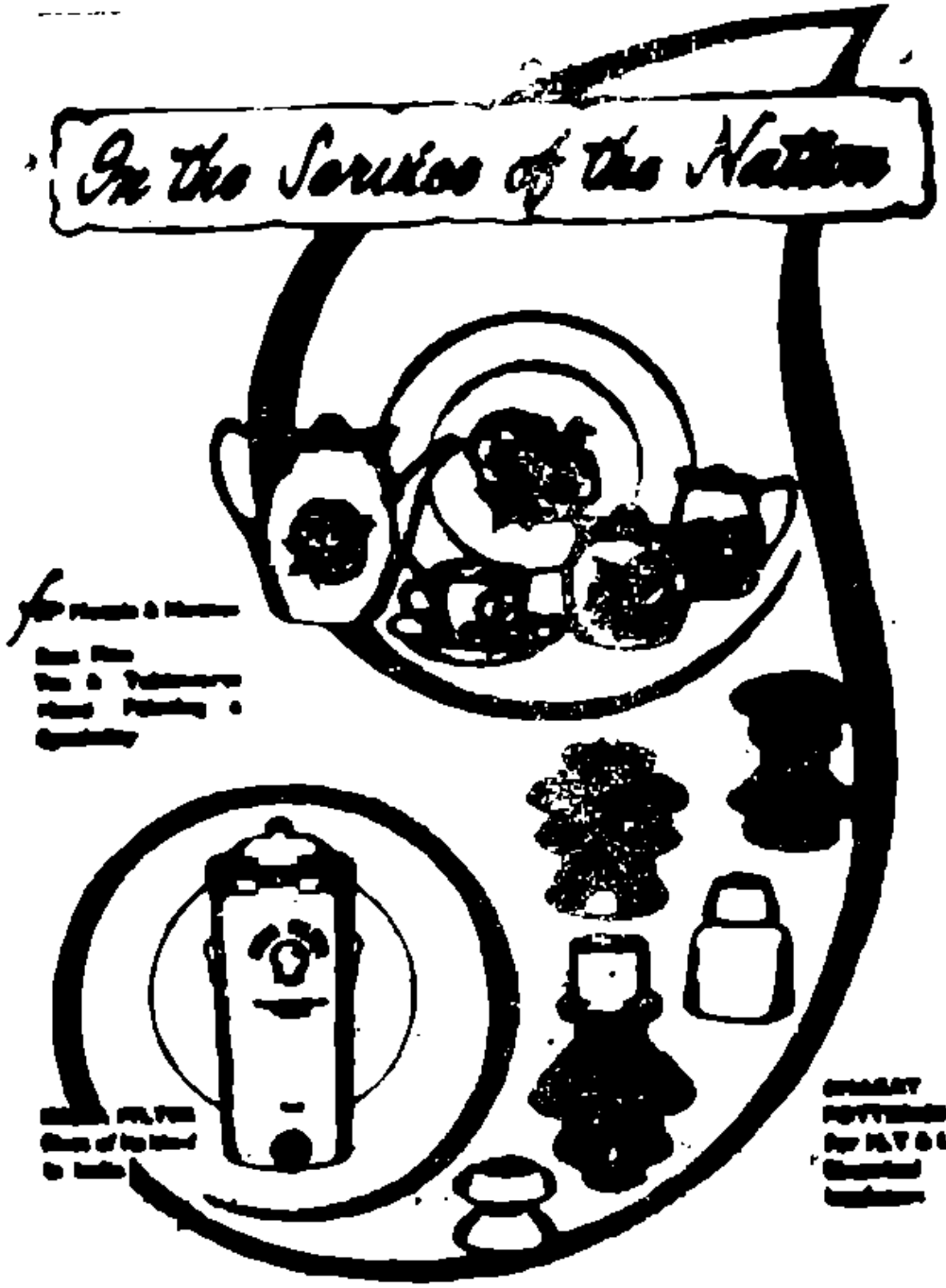

INDIA POTTERIES LIMITED
[illegible] STREET, CALCUTTA-13

DEC 1979

মুখ-পত্রিকা পাঠান স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী উমানন্দ। মুখ-সম্পাদক স্বামী শীলানন্দ ও ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। সহ-সম্পাদক—স্বামী হীরণ্যানন্দ ও স্বামী প্রশান্তানন্দ। প্রচার সচিব—স্বামী অমলানন্দ, স্বামী অমলেশ্বরানন্দ, স্বামী অমলানন্দ ও ডঃ গোপাল চৈতন্য।

প্রতি সংখ্যা : এক টাকা মাত্র। বার্ষিক মূল্য : বারো টাকা মাত্র।